দ্বিমাসিক
মঙ্গলবার্তা
১১শ বর্ষ ২য় সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টীয় জীবন
গঠনের পত্রিকা

প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ
যোসেফ বিশ্বাস

❋

সহ-সম্পাদক ঃ
ফাঃ পিও মাত্তেভি, এস.এক্স.
ফাঃ বাবলু সরকার
মিঃ সন্তোষ মণ্ডল

❋

সার্কুলেশন ঃ
দাউদ মণ্ডল

❋

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ

জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৭৫ টাকা

সম্পাদকীয়

সমাজ পরিবর্তনের জন্য জনসচেতনতা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও ইচ্ছা থাকা অপরিহার্য। এটা সচেতন মানুষের পক্ষ হতে সমাজের প্রতি অঙ্গীকার। সামাজিক অঙ্গীকারের পটভূমি বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা ও উৎস হতে সৃষ্ট। ভুক্তভোগী মানুষ সে অঙ্গীকারে সাড়া দেয় তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যা সে অর্জন করেছে সমাজের নানা বৈষম্য ও অন্যায্যতার বাস্তবতা থেকে কিংবা চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো থেকে। এ থেকেই সে একটা তাগিদ অনুভব ক'রে কিছু একটা করার।

তার প্রেরণা জাগতে পারে মানবতাবাদ দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। এ দর্শন মানুষকে শিক্ষা দেয় মানুষকে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দিতে এবং সকল মানুষকে সমান ভাবতে। এর ফলে সেই সমমর্যাদার জন্য কাজ করতে সে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

ধর্মের প্রেরণাশক্তিও অত্যন্ত প্রবল। তা মানুষকে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে কারণ মানুষ সে অঙ্গীকারকে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ হিসাবে গ্রহণ করে।

অন্য আর একটি প্রেরণা হল, মতাদর্শ (ভাবদর্শন) যা মানুষকে আবেগতাড়িত করে এবং এর লক্ষে পৌছানোর জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ মতাদর্শকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে নেওয়া যেতে পারে, যা বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা রক্ষায় সহায়ক হতে পারে।

ধর্ম মানবজীবনের সকল পরিমণ্ডলে তার প্রভাব ফেলে এবং

সম্পাদক কর্তৃক ২৪/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং
জেরী প্রিন্টিং, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

সকল ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষমতা রাখে। ধর্ম কেবল সামাজিক কাজকেই জাগ্রত করে না কিন্তু পাশাপাশি তা সামাজিক ন্যায়বিচারের সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করে। এই জগতে যত ভুল আর যত অন্যায়ের পরিবর্তন ও সংস্কার করা মানুষের আবশ্যকীয় কর্তব্য।

খ্রীষ্টধর্মে সামাজিক অঙ্গীকারের অংশ হিসাবে ন্যায় বিচারকে সব সময় সম্মুখে রাখা হয়েছে। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দেখানো হয়েছে যে, ঈশ্বর দরিদ্র নিপীড়িতদের ভালবাসেন ও রক্ষা করেন। যীশুর প্রচারের কেন্দ্র হল ঐশরাজ্য ঃ যেখানে ন্যায্যতা, প্রেম ও সমতা প্রাধান্য পায়। মণ্ডলীর পিতাগণ দরিদ্রদের প্রতি অগ্রাধিকারকে সমর্থন করেছেন। মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষাসমূহ সমাজ পরিবর্তনে অপরিহার্য নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করতে পারে।

অন্যান্য ধর্ম, যেমন হিন্দু ধর্ম সকলের ও সর্বজীবের মঙ্গলের কথা বলে। সর্বজীবের একতা, পবিত্রতা, পৃথিবীর প্রতি, বৃক্ষরাজির প্রতি, নদী-নালার প্রতি, পশুপাখীর প্রতি সম্মান করতে, সর্বজীবের কল্যাণে কাজ করতে পরমানন্দিত হওয়ার আবেদন জানায়।

ন্যায়বান হওয়া ও ন্যায়পরায়নতার চর্চা ইসলাম ধর্মে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের দায়িত্ব হল দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য ব্যবস্থা করা।

সামাজিক রূপান্তরে ধর্ম একটি অত্যন্ত শক্তিশালী উৎস হতে পারে। তবে'ধর্ম উভয়বল। অর্থাৎ তা মানুষকে দাসে পরিণত করতে বা ক্ষমতা প্রদানে ভূমিকা পালন করতে পারে। ধর্মকে চালিত হতে হবে একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়, সহনশীল এবং অনেক বেশী ক্ষমতাপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গঠনের দিকে। মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা তার ব্যবহারিক উপস্থাপন বা কাজের মধ্য দিয়ে অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

১

ধর্ম এবং সামাজিক অঙ্গীকার

John C. D'Mello

ক) সামাজিক অঙ্গীকারের উৎসসমূহ

যারা সমাজের উন্নয়ন নিয়ে আগ্রহী তাদের নিকট লোকদের সামাজিক দিক থেকে অঙ্গীকারবদ্ধ করে এমন সবকিছু জানাই মুখ্য বিষয়। একটি সমাজে জনগণ যত বেশী অঙ্গীকারবদ্ধ, সেই সমাজের রূপান্তর হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশী। সামাজিক অঙ্গীকার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক লাভমুখী বহুজাতিক কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান আবেগের সাথে উল্লেখ করে থাকে যে, সামাজিক দায়িত্বের প্রতি তারা অঙ্গীকারবদ্ধ। তবে তারা এ কথা দ্বারা সমাজের কাঠামোগুলিকে সমান, ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলা বুঝান না। এ কথার দ্বারা তারা সাধারণত: দানশীলতা বা জনসেবাকেই বুঝান।

শব্দগত অর্থে সামাজিক অঙ্গীকার হচ্ছে সমাজে এক বিশেষ ধরনের সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের গভীর বাসনা – এমন এক পরিবর্তন যা সব ধরনের সমতার অধিকতর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করবে, যা দুর্বল শ্রেণীর মানুষের জন্য সম্পদের অনেক বেশী সহজলভ্যতা নিশ্চিত করবে। **প্রকৃত সামাজিক অঙ্গীকারের সর্বোত্তম সংজ্ঞা হচ্ছে সমাজের কাঠামোগুলোর পুনর্বিন্যাস, যেন এ থেকে সর্বাপেক্ষা কম সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষ উপকৃত হতে পারে।**

সামাজিকীকরণের অভিজ্ঞতাসমূহ

সামাজিক অঙ্গীকার অনেকটা বিভিন্ন উৎসজাত একটি প্রাকৃতিক ঝরণাধারার মত। সর্বপ্রথমত:, সামাজিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অন্যায়, অসমতা আর বৈষম্যের অভিজ্ঞতা অনেক সাহায্য করে। সরাসরি একটি অভিজ্ঞতা অনেকটা দেহে একটি গভীর ক্ষত বা জখমের মত, যা পরিশেষে এ ব্যাপারে কিছু করতে চাওয়ার প্রথম ব্যতিব্যস্ততাগুলোর পথ সুগম করে। সমাজবিদরা একে 'একটি সামাজিকীকরণের অভিজ্ঞতা' বলে অভিহিত করেন। প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীকে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, শুধুমাত্র এ কারণে যে তিনি ছিলেন একজন ভিন বর্ণের মানুষ, তখন বৈষম্য সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এ ঘটনাই ছিল জাতিবাদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকারের সূচনা, যা পরবর্তীতে তাঁকে ভারতে ফিরে গিয়ে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করার দিকে চালিত করেছিল।

গান্ধীর মত বৈষম্যমূলক 'স্মরণীয়' ঘটনার শিকার একজন নাও হতে পারে, তবে অপমানিত হওয়া, লজ্জিত হওয়া, লাঞ্ছিত হওয়ার শত শত দৃষ্টান্ত বা ঘটনা রয়েছে। আর গুরুতর অবিচারের অভিজ্ঞতাধারী কোন ভাই বা বোনের পাশে এসে যদি কেউ দাঁড়ায়, তাহলে সেক্ষেত্রে সামাজিক অঙ্গীকারের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে আর ফুসে ওঠে। Long Walk to Freedom নামের তাঁর জীবন-গ্রন্থে নেলসন মাণ্ডেলা উল্লেখ করেছেন ঃ আমার একমাত্র সম্বল ছিল হাজারো অবমাননা, হাজারো অসম্মান, ভুলে যাওয়া হাজারো স্মৃতির এক অবিচল পাহাড়, যা আমার মধ্যে জন্ম দিয়েছিল ক্রোধ, বিদ্রোহাচরণ, আর সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের বাসনা ,যা আমার লোকদের বন্দী করে রেখেছিল। পরে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে নেলসন মাণ্ডেলা এবং অলিভার তাম্বো আইনপেশার কাজ শুরু করলে, তারা সপ্তায় সপ্তায় কৃষক, নারী ও পুরুষের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার দিতেন। এ সকল সাক্ষাৎকারে প্রতিনিধিগণ জানাত, শ্বেতাঙ্গদের থাকার জায়গার জন্য কিভাবে তাদেরকে ভূমিহীন করা হয়েছে

কিংবা কিভাবে তাদের বসতভিটা থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। অমর্যাদা ও অবমাননার এ সকল গল্প দিন-রাত শুনতে শুনতে মাগুেলা ও তাম্বো এক সময় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রতিবাদ করার জন্য উদ্দীপিত হয়েছিলেন।

সামাজিকীকরণের অভিজ্ঞতাকে আরও ব্যাপক অর্থে বুঝা যেতে পারে। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরিদর্শন কর্মসূচী, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীগণকে কিংবা হতে পারে সমাজকর্মীগণকে সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ে বসবাসকারীদের জীবন ও অভিজ্ঞতার নিরিখে মেলে ধরা হয়। তাদের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে, সাময়িকভাবে বস্তিতে কিংবা অজপাড়াগাঁয়ে থাকতে বলা হয়, যেন তারা সমাজে যারা মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে তাদের বাস্তব শোচনীয় অবস্থা অভিজ্ঞতা করতে পারে। আশা করা হয় এই পরিদর্শন কর্মসূচী ছাত্র-ছাত্রীদের কিংবা সমাজকর্মীদের দারিদ্র বিমোচনকে তাদের জীবনের লক্ষ্যসমূহের একটি অংশ করে তুলতে উদ্বুদ্ধ করবে। এমনকি একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিংবা একটি পরিদর্শন কর্মসূচী ছাড়াই, মুক্তিযোদ্ধা কিংবা সমাজকর্মীদের ছেলেমেয়েরা সামাজিক অঙ্গীকারের মূল্যবোধগুলিকে আত্মস্থ করে নিয়ে সুনিপুনভাবে বেড়ে ওঠে। এ সকল ছেলেমেয়েরা অনেক সময় এমন সব পেশা বেছে নিতে পছন্দ করে যেগুলির রয়েছে সামাজিক ন্যায্যতার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা। তাই বলা যায়, তাদের সামাজিক অঙ্গীকার তারা লাভ করে বাড়িতে তাদের সামাজিকীকরণের অভিজ্ঞতা থেকে।

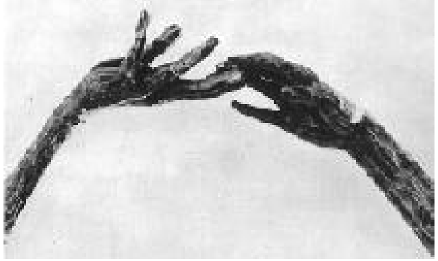

মানবতাবাদ

দ্বিতীয় একটি উৎস হচ্ছে মানবতাবাদ, যা সামাজিক অঙ্গীকারের স্রোতধারাসমূহে অবদান রাখে। মানবতাবাদ হচ্ছে এমন একটি ভাবনা বা দর্শন যা বিশ্বাস করে যে, সকল মানুষকে সমানভাবে সম্মান করা ও মর্যাদা দেওয়া উচিত, কারণ তারা সবাই মানুষ। মানবতাবাদীগণ সাধারণত তাদের ধর্মীয় বা অতিলৌকিক উদ্দেশের উর্ধ্বে সকল মানুষের সঙ্গে সংহতি ও একত্ববোধ থেকে মানব কল্যাণের জন্য কাজ করেন। তারা বর্ণ, জাতি, গোত্র, বয়স, বংশ, জন্মস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য কিংবা দুর্ব্যবহার প্রদর্শন ঘৃণাভরে অস্বীকার করেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে, মানবতাবাদের কৃতিত্ব হল শিশু শ্রম আইনের উন্নয়ন ও প্রসার ঘটানো, যে আইন শিল্প-বিপ্লবের গোলযোগের পর শিশুদের জঘন্য শ্রম অবস্থার অবসান ঘটিয়েছিল ।

আজকে, জাতিসংঘ আর অন্যান্য বিশ্ব সংস্থা প্রণীত মানবাধিকারগুলোর সংরক্ষণে মানবতাবাদীগণের ভূমিকা অপরিসীম। কখনো কখনো 'জনহিতকর সাহায্য' শব্দের ব্যবহার ঘটে আর্ন্তজাতিক রেড-ক্রস ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ভূমিকম্প, বন্যা ও সুনামীর সময় পরিচালিত বিপর্যয়কালীন ত্রাণ ব্যবস্থাপনার সময়, এছাড়াও মাদার তেরেজার ন্যায় ব্যক্তিত্বদের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেগুলোর লক্ষ্য হল, দুঃস্থ আর মরণাপন্নদের দরিদ্রতা ও দুঃখকষ্টের উপশম ঘটানো।

কোন একটি জনহিতকর দর্শন কারোর প্রকৃত সামাজিক অঙ্গীকারকে উদ্যমশীল করেছে – এ রকম একটি সুদৃষ্টান্তের অধিকারী হচ্ছেন মেধা পাটকর, যিনি হচ্ছেন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের প্রধান কর্মী। তাঁর প্রধান ভাবনা ছিল এক মিলিয়ন বাস্তুচ্যূত আদিবাসী আর কৃষকদের পুনর্বাসন। তিনি আরও উদ্বিগ্ন ছিলেন নর্মদা বাধের সামাজিক ও পরিবেশত প্রভাব নিয়ে – বন ও আবাদী জমি হারানো, জমির লবণাক্ততা, মাছ তথা জলজ প্রাণী নির্মূল। মূলতঃ তিনি সোচ্চার ছিলেন এ কারণে যে, এ প্রকল্প নিয়ে আদিবাসী আর কৃষকদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি, কিংবা প্রদর্শন করা হয়নি তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান।

মেধা পাটকরের জনহিতকর কাজের সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে তাঁর কষ্টনির্যাতন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে। আন্দোলনের বিগত ১৪টি বছর ধরে, তিনি ঘন ঘন পুলিশ আর সরকারের হয়রানির শিকার হয়েছেন, আর আটক না হওয়ার জন্য তাকে ঘন ঘন লুকিয়ে আর পালিয়ে থাকতে হয়েছে। তাই যখন কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এ সকল কষ্টনির্যাতনের প্রতি তার মনোভাব

কী ?", তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন এই বলে, "আমি এগুলোকে কষ্টনির্যাতন হিসেবে দেখি না। আমার লক্ষ্য আদিবাসী আর কৃষকদের সঙ্গে সংগ্রাম করে যাওয়া। এই পথে অবশ্যই কিছু বাধা আর ঝুঁকি থাকবে, যেগুলিকে জয় করতে হবে।" এটা হচ্ছে একজন, যার সামাজিক অঙ্গীকার জনহিতকর দর্শন থেকে জাত, তার আদর্শ মনোভাবের দৃষ্টান্ত। পক্ষান্তরে, যখন মাদার তেরেজাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এ ধরনের অপ্রীতিকর কাজ, যেমন গৃহহীন ও দুঃস্থদের ধোয়ানো-মোছানো, ইত্যাদি করার জন্য শক্তি আর প্রেরণা তিনি কোথা থেকে পান, তখন তাঁর উত্তর ছিল, "আমি তাদের মধ্যে খ্রীষ্টকে দেখতে পাই।"

ধর্ম

মাদার তেরেজার উত্তর আমাদের **তৃতীয় একটি প্রবাহ** হাজির করে যা লোকদের সামাজিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে, আর তা হল ধর্ম। ধর্মের প্রেরণার শক্তি অত্যন্ত বলিষ্ঠ হতে পারে। ধর্ম ব্যবস্থা করে বিভিন্ন আবেগঘন প্রতীকসমূহের, যেমন প্রতিকৃতি, ধর্মানুষ্ঠান, সাক্ষ্যদান, অতিকথা ও ধর্মীয় গীতিনাট্য; এগুলি কাজ করার জন্য প্রেরণাকে অনুপ্রাণিত করতে, সুস্থির রাখতে আর প্রতিপালন করতে পারে। আমি যদি কাউকে বলি, "ভাল হবে, যদি তুমি এটা কর !", তাহলে তা সম্ভবত অনেক কম অঙ্গীকারকে উদ্দীপিত করবে, কিন্তু "ঈশ্বরের ইচ্ছা, তুমি এটা কর" এমন কথা অনেক বেশী অঙ্গীকারকে উদ্দীপিত করবে। এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল।প্রণোদনা/আত্মনিবেদন/অপরাধ বা ভয়কে জাগিয়ে তোলে অতীন্দ্রিয়, যা হল সুদূর দেশগুলিতে প্রেরণকাজে গমনের আর মধ্যযুগে বিভিন্ন ধর্মযুদ্ধের কারণ। এটাই মাকাবীদের প্রেরণা যুগিয়েছিল সেলিউকীয়দের প্রবল বল ও শক্তি প্রতিরোধে, এটাই আত্মঘাতী বোমারুদের আর আধুনিক সন্ত্রাসীদের একটি কারণের নিমিত্তে নিজেদের জীবন সঁপে দিতে উদ্দীপ্ত করে। ধর্মের রয়েছে একটি সুবিধাজনক অবস্থান, যা একে প্রদান করে জগতকে সমালোচনার অনন্য ক্ষমতা। ঐশ প্রভুত্বের প্রতি তাদের আনুগত্যের নামে, অনেক ধর্মবিশ্বাসীকে বিদ্যমান ব্যবস্থাসমূহকে উদাত্ত আহ্বান আর সমালোচনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।

ধর্ম কর্তৃক প্রদত্ত অর্থবহ বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি আর 'সহভাগিতাকৃত পরিচয়' শুধুমাত্র যে সমাজগুলিকে সমন্বিত আর ঐক্যবদ্ধ করতে পারে তা নয়, পাশাপাশি এগুলি আদর্শ হিসেবে সংহতি, সম্মিলিত অভিন্ন কাজ এবং দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কাজ করতে পারে। এইভাবে ধর্ম হতে পারে সমাজ পরিবর্তনের এক শক্তিশালী উৎস, এছাড়া লোকদের মনোভাব রূপান্তরের আর সমাজের কাঠামোগুলিকে পুনর্বিন্যাস ও নবায়িত করার লক্ষ্যে দল ও সংঘকে উদ্দীপ্ত করার উৎস হতে পারে। এটা আবার কখনো কখনো হয়ে উঠতে পারে জগতে ওলটপালটকারী বৈপ্লবিক শক্তি।

অন্যদিকে, ধর্ম একটি খুবই রক্ষণশীল শক্তিও হতে পারে , যা কি-না বর্তমান সামাজিক অবস্থাকে বৈধতা দান, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। ধর্মান্ধরা ধর্মকে ব্যবহার করে জাতবাদকে শক্তিশালী করার এবং বর্ণবাদ নীতি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য; আর ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করা হয় লোকদেরকে সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করার জন্য। ধর্মশাস্ত্রগুলোকে আহ্বান করা হয় রাজার ঐশী অধিকারকে সমর্থন যোগানোর আর সমাজের শ্রেণীবিন্যাসগত কাঠামোর নিরাপত্তাবিধানের জন্য।

সুতরাং বলা যায় **ধর্ম দু'ধারী তলোয়ার** । সামাজিক ভাবনার প্রতি এর মনোভাবের উপর নির্ভর ক'রে একে ব্যবহার করা যেতে পারে সামাজিক অঙ্গীকারকে নির্জীব কিংবা উদ্দীপিত করতে। সুতরাং অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকার ব্যাপক বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন রয়েছে।

মতাদর্শ

সবশেষে, সামাজিক অঙ্গীকারের **চতুর্থ সহায়ক স্রোতধারাটি** হচ্ছে মতাদর্শ। মার্ক্সবাদ ও জাতীয়তাবাদের ন্যায় মতাদর্শগুলোকে অনেক সময় অভিহিত করা হয়েছে

দৃশ্যত: ধর্ম বলে। ধর্ম ও মতাদর্শের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ বেশ কঠিন, মতাদর্শগত দিকগুলো ধর্মীয় আন্দোলনে লক্ষ্য করা যায় আর আধুনিক জগতে অনেক মৌলবাদী মতাদর্শের উৎস হিসেবেও ধর্মীয় পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ভাবদর্শনগুলোর বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত দরকার।

(১) মতাদর্শগুলো অসম ধারণার কোন সংগ্রহশালা নয়, কিন্তু এগুলোর রয়েছে একটি সমকেন্দ্রাভিমুখী, সঙ্গতিপূর্ণ আর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি।

(২) মতাদর্শগুলো দাবি করে দৃঢ় বিশ্বাসের নিশ্চয়তা এবং একটি সহনীয় দৃঢ়তা। জনগণ একটি ধর্মের নামমাত্র অনুসারী হতে পারে, কিন্তু তাই বলে তারা একটি মাতদর্শের নামমাত্র অনুসারী হতে পারে না। কেননা মতাদর্শগুলো লোকদের খুবই আবেগময় করে তোলে।

(৩) মতাদর্শগুলো একটি খুবই বাস্তব দিগ্‌দর্শনের অধিকারী, এগুলি উৎসাহিত করে সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং নির্দিষ্ট কার্যক্রমকে। এই কারণে, এগুলো অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তির দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সাধারণত: সংশোধন আর সীমাবদ্ধ করে।

(৪) মতাদর্শগুলোর পছন্দ হচ্ছে যারা ইতোমধ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ তাদের মাঝে সাদৃশতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠন বা ব্যবস্থার সমষ্টিগত ধরন।

(৫) মতাদর্শগুলো বাস্তবতার একটি বিশেষ উপলব্ধিকে সমাজের সকলের জ্ঞানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলার চেষ্টা করে। এগুলো একটি বিশেষ ব্যাখ্যার আত্মস্থকরণকে এগিয়ে নেয়। একটি দল বা একটি সমাজ কোন একটি মতাদর্শকে আত্মস্থ করে নেওয়ার পর তা অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ভবিষ্যৎ ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষেত্রে মতাদর্শগুলোর রয়েছে স্বপ্নচারিতা, আদর্শায়ন কিংবা কল্পরাজ্য গঠনের একটি দিক।

সংক্ষেপে বলা যায়, **মতাদর্শকে কল্পনা করা যেতে পারে একটি দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে, আর সেই সঙ্গে একটি বিশেষ মনোগত কারণ হিসেবে** । এই কারণটি হতে পারে হয় বিদ্যমান কাঠামোগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা বিদ্যমান কাঠাগুলোর বৈধকরণ। সুতরাং সাম্যবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে একটি মতাদর্শ, আর পুঁজিবাদ হচ্ছে সামন্ততন্ত্রের বিপরীতে একটি মতাদর্শ। গণতন্ত্র এমন একটি মতাদর্শ যা রাজার ঐশ অধিকার আর গোষ্ঠীশাসনের বিরুদ্ধ। নাৎসিবাদ ছিল এমন একটি মতাদর্শ যার লক্ষ্য ছিল একটি বিশেষ জাতির আধিপত্যকে বৈধতা দান। প্রটেষ্টান্ট ধর্মমতকে এমন একটি মতাদর্শ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যার আর্বিভাব পোপের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সংক্রান্ত তত্ত্বের বিপরীতে। একইভাবে কোয়েকারবাদকে বুঝা যেতে পারে ইংলন্ড মণ্ডলী সংক্রান্ত তত্ত্বের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা একটি মতাদর্শ হিসেবে। তাই বলা যায়, মতাদর্শ হচ্ছে একটি বিশেষ দলের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ব্যাখ্যা।

সবশেষে, এমনকি অঙ্গীকারের একটি বলিষ্ঠ উৎস হলেও, মতাদর্শগুলো এ তিনটি উৎস থেকে আহরিত হতে পারে : সামাজিকীকরণের অভিজ্ঞতা, মানবতাবাদ ও একটি ধর্মীয় দর্শন। এর বিষয়বস্তুর দিক থেকে, একটি মতাদর্শ এইভাবে হতে পারে ধর্মীয়, জনকল্যাণমূলক, আর/অথবা অভিজ্ঞতাভিত্তিক।

এ সহায়িকার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, যখন ধর্ম আর মতাদর্শ একত্রিত হয়, তখন এগুলো হয়ে ওঠে একটি খুবই সম্ভাবনায় মিলন। এর ফলে একদিকে মতাদর্শ যেমন ধর্মীয় প্রণোদনার মাধ্যমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তেমনি অন্যদিকে ধর্মীয় অঙ্গীকারকে সংজ্ঞায়িত ও নির্ভুল করে তোলে এই মতাদর্শ। এই সহায়িকার একটি উদ্দেশ্য হল, কিভাবে এই মিথষ্ক্রিয়া ঘটে তা লক্ষ্য করা।

ধর্মবিশ্বাসীগণ আহূত হন না মতাদর্শ আর ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতায় কিংবা এগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করার জন্য, কিন্তু আহূত হন প্রদত্ত কোন মতাদর্শ বা ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার বৈধতাকে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করে দেখার ক্ষেত্রে সক্ষমতায় বেড়ে ওঠার জন্য। তাদেরকে অবশ্যই এ ধরনের কাঠামোসমূহের (মতাদর্শ ও ব্যবস্থাসমূহ) মধ্যে এবং এগুলোর দ্বারা কাজ করতে হবে, যদি তারা তাদের পরিবেশে দায়িত্বের সাথে কাজ করতে চায়, তবে একই সময়ে তাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয় এগুলো দ্বারা বশীভূত হওয়াকে প্রতিহত করার জন্য।

উপরের ব্যাখ্যা থেকে এটা স্পষ্ট যে, **সামাজিক অঙ্গীকার, যখন বুঝা হয় সামাজিক ন্যায্যতা আর**

কাঠামোগত পরিবর্তন হিসেবে (ভ্রাতৃপ্রেম হিসেবে নয়), বৃহত্তর অর্থে এটাও যেন হচ্ছে একটি মতাদর্শ। তাই, নিম্নোক্ত আলোচনায় আমরা জানব ধর্ম কিভাবে একটি সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত মতাদর্শের বিকাশে প্রধান শক্তি হতে পারে। তবে, এ কাজটি করার আগে, ধর্মের প্রতি আর সামাজিক অঙ্গীকারকে ঘিরে এর মনোভাবের প্রতি আমাদের দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

খ। ধর্ম ও ভাবদর্শনের মিথষ্ক্রিয়া

১। সামাজিক অঙ্গীকার সম্পর্কিত জ্ঞান

সামাজিক অঙ্গীকারের প্রতি দুই দিক থেকে দৃষ্টি যেতে পারে ঃ একদিকে হল, ব্যক্তিতান্ত্রিক কার্যক্রম যাকে বলা হয়, সামাজিক কাজের উপায় আর অন্যদিকে হল, সামাজিক-কাঠামোগত কার্যক্রম, যাকে বলা হয় সামাজিক ন্যায়বিচারের উপায়। সামাজিক কাজকে আমেরিকান হেরিটেজ অভিধানে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, একটি "সংগঠিত কাজ যার উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ বিভিন্ন সমাজ সেবার আকারে মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ, পরিচালনা আর সহায়তা যুগিয়ে, ব্যক্তিবিশেষ, দল বা সমাজের, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিতদের সামাজিক অবস্থার উত্তরণ ঘটানো।" সামাজিক কর্মপদ্ধতিগুলো সংগঠিত করা, ঘটনা পর্যালোচনা, দলীয় কাজ এবং সমাজকে সংঘবদ্ধ করে। এইভাবে, গৃহহীন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, সামাজিক কাজ গৃহহীন ব্যক্তিকে গৃহায়ন সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করে যেতে পরামর্শ দেয় কিংবা তার জন্য অস্থায়ী ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় অথবা এর থেকেও ভাল, তাকে অর্থনৈতিক সাহায্য যুগিয়ে বলা হয়, চলার মত একটা ঘর তুলে নিতে। এমনকি সমাজ সেবক একটি সমাজের সঙ্গে কাজ করলেও, চূড়ান্ত লক্ষ্য হল উত্তম "সেবা" পাওয়া।

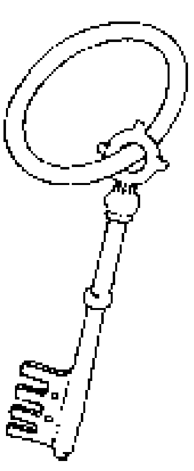

অন্যদিকে, সামাজিক ন্যায়বিচার চেষ্টা করে কাঠামোগত পর্যায়ে সমস্যা মোকাবিলার মাধ্যমে অবিচার কমিয়ে আনার – অর্থাৎ এগুলোর পরিবর্তন ঘটিয়ে : নীতিমালা, আইন, ঐতিহ্য, কাঠামো কিংবা মুখ্য কারণসমূহ যেগুলি অসম বা অন্যায্য পরিস্থিতির জন্ম দেয় কিংবা উস্কে দেয়। সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যে অবস্থিত সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক পদক্ষেপ, পরিবর্তনের জন্য জোর প্রচেষ্টা, প্রতিবাদ আর মুখোমুখি হওয়া। গৃহহীনদের গৃহ সমস্যা নিয়ে কাজ করার সময়, সামাজিক ন্যায়বিচার গৃহহীন সমস্যার মূল কারণ আর কম-দামী আবাসন অভাবের মূলগত কারণ জানার জন্য প্রথমে চেষ্টা করবে। এর পরই মাত্র গৃহহীনদের সাহায্য করবে সেই অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে – উদাহরণস্বরূপ, কল্যাণমুখী নীতি বা গৃহায়ন আইনে পবিরর্তন এনে – যাতে গৃহহীন সমস্যার সমাধান সমাজের সকলের জন্য একবারে ব্যবস্থা করা যায়।

তাহলে, **সামাজিক ন্যায়বিচার হচ্ছে সামাজিক সমস্যাকে ঘিরে একটি দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তার একটি ধরন;** এমনকি এটা সামাজিক কর্মপদ্ধতিসমূহের ব্যবহার ঘটালেও, সামাজিক ন্যায়বিচার আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সেই সামাজিক সমস্যার মূলে নিহিত বা কাঠামোগত কারণের মোকাবিলার চেষ্টা করে।

বিভিন্ন মতাদর্শ সম্পর্কিত দর্শন

সামাজিক কাজ ও সামাজিক ন্যায্যতার মধ্যে পার্থক্য জানার পর, আমরা প্রশ্ন করতে পারি, ধর্ম সামাজিক কাজের নাকি সামাজিক ন্যায়বিচারমুখী। আরেক কথায়, ধর্মকে কি নিছক বিশ্বজগতের নানা পরিবর্তন, যেগুলি কি-না মূলত: বর্তমান অবস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখে, তার জন্য তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে, নাকি একে আরও তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে সমাজের কাঠামোগুলিকে প্রভাবিত আর পরিবর্তন করার জন্য ? উত্তর নির্ভর করবে একজনের পক্ষে অনুসৃত বিশেষ মতাদর্শের উপর কিংবা সমাজবিজ্ঞান শিক্ষাদানের উপর। (১) কঠোর মার্ক্সবাদীতে কিংবা সমাজবিজ্ঞানের বৃত্তিবাদী শিক্ষাধারায় বিশ্বাসী একজন এমত পোষণ করেন যে, বর্তমান সামাজিক অবস্থা অক্ষুণ্ন রাখাই হচ্ছে ধর্মের ভূমিকা। (২) অপরদিকে Weberian কিংবা Grammscian শিক্ষাধারায় বিশ্বাসী একজন এ মত

পোষণ করেন যে, ধর্ম যে শুধুমাত্র সামাজিক অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তা নয়, পাশাপাশি এটা সমাজের সামাজিক কাঠামোগুলিকে রূপান্তরিত করতে, আবার কখনো কখনো ভেঙ্গে দিতেও সক্ষম।

সামাজিক অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই ধর্ম

কঠোর মার্ক্সবাদীদের মতে, সনাতনী ধর্ম জীবনকে অর্থবহ করলেও, এটা 'বর্তমান সামাজিক অবস্থা'কে সমর্থন যোগায় কিংবা বৈষম্যমূলক অবস্থাকে বৈধতা দান করে। বিপর্যয়, বৈষম্য আর সঙ্কটকে যুক্তিগ্রাহ্য ক'রে এবং একটি তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য দ্বারা এগুলিকে অলঙ্কৃত ক'রে, ধর্ম জগতটা যে রকম তার একটি বৈধতা দান করে। উদাহরণস্বরূপ, সনাতনী পদ্ধতিতে ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, খরা বা দুর্ভিক্ষের কারণ "মানুষের অপকর্মে দেবকূল (ঈশ্বর) রুষ্ট।" সুতরাং, ধর্ম মাত্র চেষ্টা করে দেব-দেবীদের খুশি রাখার, আর মানব কারণে সংঘটিত খরা বা দুর্ভিক্ষ নিরসনে এটা কিছু করতে পারে না।

একইভাবে, ধর্ম ধনী আর গরীবদের মধ্যে বিভেদকে "ঈশ্বরের ইচ্ছা" বলে অভিহিত করে। "গরীবরা যদি মুখ বুজে তাদের কষ্ট সহ্য করে, তাহলে পর-জীবনে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।" এখানে পুনরায় ধর্মকে দেখা হয় এমন কিছু হিসেবে যা গরীবদের তাদের দরিদ্রতার প্রধান প্রধান কারণগুলিকে ঘিরে প্রশ্ন জিজ্ঞেস ও তদন্ত করার অধিকারের টুটি চেপে ধরে। ভারতে সনাতনী হিন্দুধর্মের দাবি, পূর্বজন্মের পাপের কারণে লোকেরা নিম্ন-শ্রেণীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। ধর্মের এই উত্তর একজন ব্যক্তিকে নিজেকে নিম্ন-শ্রেণীর মর্যাদায় আত্মসমর্পণে বাধ্য করে।

কঠোর মার্ক্সবাদীদের মতে, এই কারণে ধর্মের ভূমিকা সীমিত আর মূলত: রক্ষণশীল। তারা ধর্মকে অভিহিত করে "আফিম" বলে আর সমাজের রূপান্তরে এর কোন ভূমিকা আছে বলে স্বীকার করে না। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের পরিধি সামাজিক কাজ, ভ্রাতৃপ্রেম ও ত্রাণ-সহায়তা (ক্ষুধার্তদের অন্ন যোগানো, তৃষ্ণার্তকে জল পান করতে দেওয়া, রোগী ও কারাবন্দীদের দেখতে যাওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি) এগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ, এটা শুধুমাত্র দুঃখ-কষ্ট, দরিদ্রতার আর অবিচারের উপশমকারী হিসেবে কাজ করতে পারে।

বৃত্তিবাদীগণ ধর্ম সম্পর্কে একটি অনেক বেশী জটিল ধারণা পোষণ করলেও এর একটি নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় বিশ্বাসী। তাদের মতে, ধর্ম একটি "সহভাগিকৃত মূল্যবোধ ব্যবস্থাকে" উৎসাহিত আর শক্তিশালী করে; এই মূল্যবোধ ব্যবস্থা হচ্ছে আঠার মত, যা সমাজকে একত্রে আবদ্ধ করে রাখে। ধর্মীয় প্রতীকগুলো হচ্ছে সমাজে একটি সমন্বিত শক্তি, যখন পূজার্চনা আর সমাজে ন্যায়ধর্মের অন্যান্য দিকগুলো এই ভূমিকাকে শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিকন্তু, 'লোভ করবে না', 'চুরি করবে না' ইত্যাদির ন্যায় নৈতিক আদেশ-নির্দেশগুলো প্রবণতাগুলিকে সংযত রাখে আর একজন 'যা-কিছু করতে ইচ্ছা করে তা করা' থেকে তাকে দূরে দূরে রাখে। এটা ঐকমত্য গড়ে তোলে। অনুরূপভাবে, উপাসনা-অনুষ্ঠানাদি, উপাসনা-পদ্ধতি, গান, ধর্মপ্রচার আর ধর্মীয় শিক্ষা এগুলোর সবক'টির প্রবণতা হল, লোকদের একতার বন্ধনে আবদ্ধ করা, তাদের মধ্যে একত্ব ও সমাজবোধ জাগিয়ে তোলা।

তাহলে, আলোকপাতটি হচ্ছে যারা বিপথগামী তাদের একতার বন্ধনে আবদ্ধ করার, ঐক্যবদ্ধ করার উপর। অতএব, প্রশ্ন করার, সমালোচনা করার, সামাজিক অঙ্গীকার বিনষ্ট করা ইত্যাদি করার কোন সুযোগ নেই, কারণ প্রশ্ন করা দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটায়, আর দ্বন্দ্ব ঐকমত্যের পরিপন্থী। সুতরাং, **বৃত্তিবাদীদের মতে, সমাজ-ভাবনায় ধর্মের অংশগ্রহণ সামাজিক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ,** যেমন লোকদের সমস্যার সমাধান, বিপথগামীদের পরামর্শদান, লোকদের দুর্গতির লাঘকবরণ। এটা সুনির্দিষ্টভাবে কোনরূপ সমাজসেবা বা সামাজিক কাজকে কিংবা কোনরূপ আন্দোলনকে হিসেবের মধ্যে নেয় না, কেননা তেমন কাজ সামাজিক কাঠামোগুলিকে যেমন প্রভাবিত করবে তেমনি সামাজিক শৃঙ্খলা ও সমাজের ঐক্য ব্যহত করবে। এ সকল নানা কারণে, বৃত্তিবাদীগণ সমাজে ধর্মের একটি ব্যক্তিগত ভূমিকার বাসনার কথা ব্যক্ত করেন।

সামাজিক ব্যবস্থা রূপান্তরকারী হিসেবে ধর্ম

অপর দিকে Weberian কিংবা Grammscian মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মের স্বয়ং অতীন্দ্রিয়তাকে এমন একটি বিষয় হিসেবে দেখে যার নিজেরই মধ্যে সমাজ সমালোচনা আর সমাজ ধ্বংসের বীজ বিদ্যমান। ক্ষণস্থায়ী জীবনের উর্দ্ধে ও বাইরে একটি বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতাকে

প্রতিষ্ঠা ক'রে, Weberian কিংবা Grammscian-গণ এমত পোষণ করেন যে, এমন একটি স্বাধীন ও সুবিধাজনক স্থান ধর্মের দখলে রয়েছে যা বৈষম্য ও অবিচার-ভরা জগত থেকে দূরে অবস্থান করে আর এর সমালোচনামুখর। ধর্মের বা অতীন্দ্রিয়তার রয়েছে একটি চূড়ান্ত ভিত্তি যার উপর নির্ভর ক'রে অস্থায়ী বা পার্থিবকে বিচার করতে হবে। এইভাবে, উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি সরকার ব্যক্তির বা সমাজের অধিকারকে অমান্য করে, তখন আক্রান্ত ব্যক্তি বা সমাজ তার/তাদের অধিকার আদায়ের ভিত্তি হিসেবে 'অতীন্দ্রিয়তার' নিকট মিনতি জানাতে পারে। এটাই হল, এ বিখ্যাত অনুশাসনের অর্থ, "ঊর্ধ্ব শক্তির প্রতি আমাদের আনুগত্য"। এই অর্থে রাজা বা সরকার আর সর্বময় অধিকর্তা নয়, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান।

Weber অনুসারে, সামাজিক/অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক/ধর্মীয় পরিমণ্ডল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত আর একটি পরিমণ্ডলের পরিবর্তনের অর্থ অপর একটি পরিমণ্ডলের উপর এর প্রভাব। ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম, আর এ ধারণা মার্ক্সের ধারণা থেকে ভিন্ন, যিনি ধর্মকে অভিহিত করেছেন 'আফিম' ব'লে, কেননা তাঁর মতে ধর্ম সামাজিক রূপান্তরে কোন ভূমিকা পালন করেনি। The Protestant Ethnic and the Spirit of Capitalism শীর্ষক গ্রন্থে Weber দেখিয়েছেন কিভাবে প্রোটেস্টান্ট আধ্যাত্মিকতা – সময়, কঠোর শ্রম, অর্থ আর মুনাফার মূল্যবোধে বিশ্বাস আর ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক – যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উত্থান ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। একইভাবে, তার ভারতীয় উপমহাদেশ সমাজ গবেষণায়, তিনি এটা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন যে, এমনকি সব রকমের আলামত থাকা সত্ত্বেও, এ মহাদেশে পুঁজিবাদ প্রসার লাভ করতে পারেনি। এর কারণ মূলত: এগুলোয় হিন্দু বিশ্বাস : নিয়তিবাদ, কর্ম, একটি শ্রেণী শাসিত সমাজ, আর শ্রমের ফলের প্রতি ভগবদ গীতার উদাসীনতা। সুতরাং, **Weber এর প্রস্তাব, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনে লোকদের "উদ্বুদ্ধ" করার ক্ষমতা ধর্ম রাখে।**

Weber এর ন্যায় আন্তনিও গ্রামস্কি দাবি করেছেন যে, সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো (যার মধ্যে অন্তর্গত ধর্ম) আর বৈষয়িক অর্থনৈতিক ভিত্তি –এ দু'টি একে-অপরকে পারস্পরিকভাবে প্রভাবিত করে। Weber এর ন্যায় তিনিও জোর দাবি করেছেন যে, সামাজিক শ্রেণীভেদে ধর্মীয় ধারণাসমূহের হেরফের ঘটে; সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকদের রয়েছে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ধ্যানধারণা আর সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের রয়েছে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ধ্যানধারণা। তবে গ্রামস্কির মতে, উচ্চ শ্রেণীর লোকদের ধ্যানধারণাগুলো পুরোপুরি কর্তৃত্বশীল নয়। কৃষক আর শ্রমিক শ্রেণীর অনন্য জীবন-অভিজ্ঞতা জন্ম দেয় "লোকায়ত ধর্মবিশ্বাস" সংক্রান্ত নানা ধ্যানধারণার, যেগুলোর প্রায়শ: বিরোধ বাধে 'আনুষ্ঠানিক', গোঁড়া শিক্ষার সঙ্গে, বিশেষ করে অভিজাত শ্রেণীর ধ্যানধারণার সঙ্গে। গ্রামস্কি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, গোঁড়া ধারণাগুলো বিপরীতধর্মী শক্তিতে বিকশিত হতে পারে, বিশেষ করে নিম্ন শ্রেণীর মধ্য থেকে যখন 'সুসংবদ্ধ' বুদ্ধিজীবিদের আবির্ভাব ঘটে যারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সৃজনশীল নানা ধ্যানধারণা আর সাদৃশ্যময় সামাজিক নানা কাঠামোর জন্ম দেয়। এইভাবে, **Weber আর গ্রামস্কির অনুসারীদের মতে, ধর্ম শুধুমাত্র সামাজিক কাজকেই জাগ্রত করে না, পাশাপাশি এটা সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রামকেও উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে।**

সুতরাং একজন বলতে পারে, একজন ধর্মবিশ্বাসীর অনুসৃত বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ সামাজিক অংশগ্রহণ বিষয়ক তার জ্ঞানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত। এ ধর্মানুসারী মার্ক্সবাদী কিংবা বৃত্তিবাদী মতবাদের অনুসারী হলে, তিনি সম্ভবত ধর্মকে সর্বোত:ভাবে অগ্রাহ্য করবেন। আর এ ধর্মানুসারী Weber কিংবা গ্রামস্কির মতবাদের অনুসারী হলে, তিনি খুব সম্ভবত সামাজিক ন্যায়বিচারে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন।

২। ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান

সামাজিক অঙ্গীকারে ধর্মের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটি মুখ্য পার্থক্য খোদ ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এখানে দেখা মেলে অন্তত:পক্ষে দু'টি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি বা কাঠামো ঃ **সনাতনী/মৌলবাদী** কাঠামো আর **আধুনিক/মুক্তিবাদী** কাঠামো।

ধর্মশাস্ত্রের একটি খুবই আক্ষরিক, ধর্মতাত্ত্বিক আর অনৈতিহাসিক ব্যাখ্যার অনুসরণে, সনাতনী/মৌলবাদী কাঠামো ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পরিবার, পুনঃজননশীল জীবন ও লিঙ্গের ক্ষেত্রে ধর্মের একটি ভূমিকা লক্ষ্য করে। অন্যদিকে, ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কিত একটি বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক জ্ঞানের অনুসরণে আধুনিক/মুক্তিবাদী কাঠামো ধর্মের ভূমিকাকে প্রধানত: সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক কাঠামোসমূহের রূপান্তরের মধ্যে লক্ষ্য করে ।

দু'টি স্বতন্ত্র বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি

মৌলবাদী আর মুক্তিবাদীদের মধ্যে পার্থক্য প্রধানত: তাদের তুলনাধর্মী কাঠামোর উপর ভিত্তি করে – জগত, নৈতিকতা আর যুক্তিবুদ্ধি ও বিশ্বাসের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদের চূড়ান্ত ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি। মৌলবাদীগণ নিজেদেরকে প্রধানত: বিশ্বাসের উপর, ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণী ও স্বর্গীয় বিধানের উপর দাঁড় করান। তারা সবকিছুকে দেখেন সাদা বা কালো, ভাল বা মন্দ, বন্ধু বা শত্রু হিসেবে। নৈতিকতা একটি একান্ত নিজস্ব বিষয় যার মধ্যে অন্তর্গত আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডল। অপরদিকে, মুক্তিবাদীগণ আধুনিক বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে, বিশ্বাস ও যুক্তিবুদ্ধির মধ্যে কোনরূপ বিরোধ দেখতে পায় না। তাদের নিকট জগত একটি মানব প্রকল্প আর নৈতিকতা অবশ্যই বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের অন্যায্য কাঠামোগুলি পরিবর্তনে সাহায্য করবে।

মৌলবাদীগণ সমাজে ধর্মের অবক্ষয় নিয়ে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন আর শঙ্কিত। তারা ধর্মীয় কাঠামোগুলি পুনর্বহাল রাখতে চায় আর এ জন্য তারা সংগ্রামী হতেও প্রস্তুত। তারা ধর্মকে 'লোকায়তকরণে' অবদান রাখে এমনসব 'মন্দ' শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী হয়ে ওঠে (যেমন যুক্তিবাদ, আধুনিকবাদ, বহুত্ববাদ আর নারীর পুরুষের সম অধিকারবাদ ইত্যাদি), তাদের বিশ্বাস এ সকল 'মন্দ' শক্তিই হচ্ছে ধর্মীয় কাঠামোগুলির ভাঙ্গনের প্রধান কারণ। এই কারণে মৌলবাদীরা যুক্তিবাদ বিরোধী, আধুনিকবাদ বিরোধী, নারীবাদ বিরোধী আর বহুত্ববাদ বিরোধী। সামাজিক ন্যায়বিচার ধারণাটির উদ্ভব 'আধুনিক' যুক্তিবাদিতা থেকে। তাই সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে মৌলবাদীদের বিরোধিতা করা আর আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনে ধর্মের ভূমিকার তীব্র ঘৃণা করা হয়।

মৌলবাদীদের মতে, জগতের বাস্তব সমস্যা আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলেই নিহিত, যা হচ্ছে স্বর্গীয় বিধানের অবমাননাকর অবহেলা। তাই, তাদের শক্তিকে তারা এ সকল বিধানের প্রকাশ্য পুনর্বহালের দিকে চালিত করেন, আর তাদের নিকট পুনর্বহালের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলি হল পরিবার, পুনঃজননশীল জীবন আর লিঙ্গ। তাদের মতে, শত শত বছর আগে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশ-পরিস্থিতির জন্য লিখিত, ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত স্বর্গীয় বিধি-বিধান এখনো কার্যকর। ধর্মশাস্ত্রের এই আক্ষরিক ব্যাখ্যার আলোকে, তাদের প্রধান নৈতিক গুরুত্বারোপ হচ্ছে সনাতনী ধর্মীয় পালন ও বিধানের পুনঃদাবির উপর; তাই, তাদের আলোকপাতটি হচ্ছে উপাসনার স্থান ও ধর্মানুষ্ঠানবিধির উপর, গৃহে নারীর ভূমিকার উপর, গর্ভপাতের উপর, সমকামী বিয়ে এবং এই রকম আরও অনেক কিছুর উপর।

মুক্তিবাদীদের মতে, বিশ্বাস যুক্তিবুদ্ধির পরিপন্থী নয় এবং ধর্মশাস্ত্রকে বুঝবার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিবিদ্যার ব্যবহার ঘটানো একান্ত আবশ্যক। ধর্মশাস্ত্র শত শত বছর আগে লিখিত আর এটা আধুনিক পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অনেক দিক থেকে আলাদা এটা ধরে নিয়ে শাস্ত্রব্যাখ্যা বিজ্ঞানের দাবি যেন যত্নসহকারে ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করা হয়। মুক্তিবাদীদের মতে, যুদ্ধ, দরিদ্রতা, বৈষম্য, বেকারত্ব, পরিবেশ আর বহুজাতি এগুলো হচ্ছে আজকের জগতের বড় বড় নৈতিক সমস্যার কয়েকটি। ধর্মশাস্ত্রীয় নীতিমালাকে এ ধরনের বিষয়গুলোর উপর প্রভাব অবশ্যই বিস্তার করতে হবে। তাদের মতে, অর্থনৈতিক বাজেট একটি নৈতিক দলিল। মুক্তিবাদীরা এটা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, ঈশ্বর মানব চ্যানেলের মধ্য দিয়ে কাজ করেন; ফলশ্রুতিতে, সমাজের শোষিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে লোকদের 'মুক্ত করার' লক্ষ্যে আমাদেরকে অবশ্যই মধ্যবর্তীতার যত আধুনিক মাধ্যমের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। এই জগতে যত ভুল আর যত অন্যায় সবই মানব দায়িত্ব-কর্তব্যের রাজ্যের মধ্যেই নিহিত, তাই অবশ্য কর্তব্য হল এর সংস্কার ও পরিবর্তনসাধন।

২

খ্রীষ্টধর্ম এবং সামাজিক কাঠামোসমূহের রূপান্তরসাধন

যুগ যুগ ধরে, খ্রীষ্টধর্ম যেরূপ সমাজ পরিবর্তনের একটি মাধ্যম তদ্রূপ এমন একটি মাধ্যমে হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসবে যা বর্তমান সামাজিক অবস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখে। বিষয়টি পুরোপুরি নির্ভর করে একজনের দৃষ্টিভঙ্গির উপর আর সে যে-সব সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে তার উপর।

দাসত্ব, বর্ণবৈষম্য, জাতবৈষ্যম, লিঙ্গবৈষম্য আর পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইত্যাদির ন্যায় শোষণধর্মী কাঠামোগুলিকে বৈধতাদানের লক্ষ্যে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের কিছু কিছু অনুচ্ছেদের ব্যবহার ঘটানো হয়েছে। 'অনুগ্রহের ঐশতত্ত্ব'কে ঘিরে আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন জ্ঞানও অনেক বিত্তশালীদের দরিদ্রতার সামাজিক কারণসমূহের ব্যাপারে উদাসীন থাকতে অনুপ্রাণিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, "গরিব লোকদের তোমরা তো সব-সময়ই কাছে পাচ্ছ" (মার্ক ১৪:৭) – যীশুর এ উক্তির ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের জীবন ও কাজকে ধর্মময়করণ ক'রে, বিত্তশালীরা সামাজিক কাঠামোসমূহর রূপান্তর সাধনের নিষ্ফল প্রচেষ্টাকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে কিংবা যে সকল নীতিমালা ও ব্যবস্থা দরিদ্র আর নিম্ন শ্রেণীর লোকদের দূরবস্থাময় পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে, সেগুলির পরিবর্তনকে তারা অঙ্গুলিনির্দেশ না ক'রেই দান ও ভিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে 'দয়ালু সামারিয়ের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

অন্যদিকে, অনেক খ্রীষ্টান পণ্ডিত দেখিয়েছেন যে, খ্রীষ্টধর্মের তার নিজের মধ্যে সব সময় ছিল সামাজিক অঙ্গীকারের অঙ্কুর বা বীজ, যাকে বুঝা হয় সামাজিক ন্যায়বিচার হিসেবে। **ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গি এই দ্বিতীয় অংশে তুলে ধরা হয়েছে।** কোন সন্দেহ নেই যে, সামাজিক কাঠামোসমূহের পুনর্বিন্যাস নির্দেশকারী সামাজিক ন্যায়বিচার শব্দটি একটি সুন্দর আধুনিক শব্দ, আর খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের মধ্যে এর অন্বেষণ হবে কালের বিচারে মারাত্মক ভুল। তথাপি, সামাজিক ন্যায়বিচার আরও হচ্ছে একটি ছাতার ধারণা, যার মধ্যে সন্নিবেশিত বিভিন্ন উপাদান, যেমন সহানুভূতি আর নিপীড়িতদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝা; গরীবদের সহায়-সম্বলের ব্যবস্থা করা; সুবিধাবঞ্চিতদের রক্ষাকল্পে নীতিমালা প্রণয়ন করা; নিপীড়কদের দণ্ডিত করা; যারা দুর্বল আর ঝুঁকিপূর্ণ তাদের ক্ষমতায়ন ও স্বাধীন করা।

এখানে এ আলোচনায় তুলে ধরা হবে যে, **উপরোক্ত বিষয়গুলো ধর্মশাস্ত্রে আর খ্রীষ্টধর্মের ঐতিহ্যে,** যেমন পুরাতন নিয়ম, নতুন নিয়ম, মণ্ডলীর পিতৃগণ, পোপগণের সামাজিক অনুশাসনপত্র, মুক্তির ঐশতত্ত্ব, ব্যাপক প্রচলিত রয়েছে। কালভেদে, বিভিন্ন ধারণা আর মূলভাবের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল, কিন্তু এগুলোর একটি পর্যালোচনা জোরালোভাবে তুলে ধরবে যে, এগুলোর সবগুলির মধ্যে চলমান হচ্ছে অধিকতর সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক কাঠামোগুলোর পরিবর্তন সাধনের সার্বিক বাসনা।

১। পুরাতন নিয়ম

সমগ্র পুরাতন নিয়মকে চার প্রধান গ্রন্থে ভাগ করা যেতে পারে ঃ ঐতিহাসিক, বিধান, প্রাবক্তিক আর প্রজ্ঞা গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থ জুড়ে মূল বিষয় হচ্ছে 'ঈশ্বর দরিদ্র আর নিপীড়িতদের ভালবাসেন আর তাদের রক্ষা করেন'। প্রাক্তন সন্ধি বিশেষজ্ঞ Gerhad von Rad দেখিয়েছেন যে, পুরাতন নিয়মে মানব সম্পর্ক আর জীবনকে ঘিরে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলো 'ন্যায়বিচার বা ধর্মময়তাকে' আবর্ত ক'রে।

সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থে এ অভিন্ন গল্পের ধারা লক্ষ্য

করা যায় ঃ "ঈশ্বর শক্তিশালীকে নামিয়ে আনেন আর দীনজনকে তুলে ধরেন !" যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, যাত্রাপুস্তক গ্রন্থ। মোশীর নেতৃত্বে ঈশ্বর দাসত্ব থেকে ইহুদীদের মুক্তি দিয়েছিলেন আর পরাভূত করেছিলেন মিশরীয় স্বৈরশাসকদের। যাকোবের পুত্রগণের গল্পে, ঈশ্বর যোসেফের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ভাইদের কাছে প্রত্যাখ্যাত আর ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রিত হয়ে, যোসেফ অবশেষে হয়ে উঠেছিলেন মিশরের প্রধানমন্ত্রী, আর তার ভাইদের দেখাশোনাকারী। রাজা দাউদের গল্পটি হচ্ছে একজন সরল, অশিক্ষিত মেষপালকের গল্প, যিনি তাঁর গুলতির সাহায্যে সক্ষম হয়েছিলেন গলিয়াথকে ধরাশায়ী করতে আর অবশেষে রাজা হতে।

বিধান গ্রন্থগুলিও, এগুলোর বিরাট একটা অংশ, আলোকপাত করে, যারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না তাদেরকে রক্ষা করার উপর, যেমন বিধবা, অনাথ আর প্রবাসী।

তিনটি আইনসঙ্কলন – মহাসন্ধির বিধিসংহিতা (যাত্রাপুস্তক ২১-২৩), দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের বিধিসংহিতা (দ্বিতীয় বিবরণ ১২-২৬), আর পবিত্রতা সম্বন্ধীয় বিধিসঙ্কলন (লেবীয় ১৭-২৬) – ধর্মময়তাকে ব্যক্তির পছন্দ বা করুণার হাতে ছেড়ে দিতে চায়নি। এগুলো ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য বিশেষ নীতিমালা গঠন করেছিল। উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে জুবিলী ঘোষণা, যা দাবি জানিয়েছিল বিষয়সম্পত্তি আবার কিনে নেওয়ার অধিকারের, দাসত্ব থেকে সকল ইহুদীদের মুক্তির এবং জমি ছাড়িয়ে নেওয়ার (লেবীয় ২৫:৮-৫৪; ২৭:১৬-২৪)। এইভাবে জুবিলীয় ঘোষণা নিশ্চিত করেছিল সকল মানুষের মধ্যে সমতার আর নিঃস্বদের নতুন করে শুরু করার সুযোগ। অনুরূপ অন্যান্য বিধান দুর্বলদের রক্ষাকল্পে দাবি জানিয়েছিল ঋণ মকুবের (দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:১-২), গরীবদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার (দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১৯), দাসদের জন্য ভাবনার (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩:১৬), ভাড়াটে মজুরকে প্রতিদিনকার মজুরী পরিশোধের (দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১৪), কিংবা সুদ গ্রহণ (দ্বিতীয় ২৩:২০) আর প্রতারণাকে (দ্বিতীয় বিবরণ ২৫:১৩) ধিক্কার জানানোর।

প্রবক্তাগণ অত্যাচারী শাসকদের তীব্র নিন্দাজ্ঞাপনের আর প্রধান ও পদস্থদের যত অন্যায় কাজের সমালোচনা করার কারণে বিখ্যাত। আমোস, মিখা, ইসাইয়া, জেরেমিয়া আর এজেকিয়েলের ন্যায় প্রবক্তাগণ কাউকে ছেড়ে কথা বলেননি। ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে প্রধানগণ, যাজকগণ, বিচারকগণ, রাজন্যবর্গ, রাজপুত্রগণ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ আর এমনকি সাধারণ জনগণও অন্যায়ভাবে ভূমি অধিগ্রহণ, প্রতারণা, ঘুষ, জালিয়াতি আর দুর্নীতির কারণে প্রবক্তাদের গাত্রদাহমূলক মৌখিক কশাঘাতের রোষানলে পড়ত।

প্রবক্তা আমোসের ভূস্বামীদের প্রত্যাখ্যান হচ্ছে এক্ষেত্রে একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। "ওরা তো টাকার জন্যে ধার্মিক মানুষকে, সামান্য একজোড়া জুতোর জন্যে দরিদ্র মানুষকে বিক্রি ক'রে থাকে। দুর্বল-অসহায় মানুষের মাথা মাটিতে-ধূলোয় পায়ের নীচে পিষে ফেলে ওরা; দীন মানুষদের ওরা পথ থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। পিতা-পুত্র দু'জনেই একই মেয়েমানুষের কাছে যায় ... জরিমানা হিসাবে পাওয়া সুরা খেয়ে ওরা নিজেদের ঈশ্বরের মন্দিরে" (আমোস ২:৬-৮)।

প্রবক্তা ইসাইয়া বলছেন : "তোমাদের ওই যে অসংখ্য বলিদান, আমার কাছে কী-ই বা মূল্য তার ? যত মেষের পূর্ণাহুতি আর নধর যত পশুর চর্বি, এসব দেখে-দেখে অরুচি ধরেছে আমার; বৃষ, ছাগ বা মেষশাবকের রক্ত, আমি তো ওসব-কিছু চাই না ... তোমরা অসৎ কাজ আর ক'রো না, বরং সৎ কাজ করতেই শেখো; কোথায় ন্যায়ের পথ, তারই খোঁজ কর, নিপীড়ককে উচিত শিক্ষা দাও; তোমরা অনাথকে তার ন্যায্য অধিকার দাও, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর" (ইসাইয়া ১:১০,১১ এবং ১৫, ১৬)।

এইভাবে প্রবক্তাগণ নৈতিকতাকে পুনঃচালিত করেছেন ঈশ্বরের সঙ্গে খাঁটি সত্যনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে মানুষের মধ্যে অনেকবেশী সুষম সম্পর্কের দিকে,

আনুষ্ঠানিক যজ্ঞনিবেদন থেকে মানুষের মধ্যে আন্তরিক, নৈতিক সম্পর্কের আর পদদলিতদের জন্য ভাবনার দিকে।

সবশেষে, নির্বাসনকালীন আর নিবার্সন-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে লিখিত প্রজ্ঞাপুস্তকের গ্রন্থগুলি ছিল গ্রীক আর পারসিক রাজশক্তির শাসনের এক ধরনের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিরোধ। প্রজ্ঞা সাহিত্য এ ধারণা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছিল, 'কিভাবে এটা সম্ভব যে, দুর্জন আর ধর্মবিমুখরা সমৃদ্ধি অর্জন করে আর ধার্মিকেরা কষ্টভোগের শিকার হয়'। এর উত্তর দিতে গিয়ে, প্রজ্ঞা রচয়িতাগণ তাঁদের সময়কার নির্যাতিত আর দুঃখপীড়িত লোকদের আশা আর সান্ত্বনা যুগিয়েছিলেন এ অভয়বাণী শুনিয়ে যে, ঈশ্বর একদিন ধর্মময়তা ফিরিয়ে আনবেন আর তাদের দান করবেন বিজয়। যোব কাহিনীর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল, এ সনাতনী ধারণার নিপাত ঘটানো যে, কষ্টভোগ হচ্ছে, পাপের ফল। অপর একটি উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে প্রত্যাদেশীয় আকারে লিখিত দানিয়েল গ্রন্থ, এটা নির্যাতিতদের উৎসাহ যোগায় বিশ্বাসে সুস্থিত থাকার জন্য, তাদেরকে এ অভয়বাণী শোনায় যে, একদিন তারাও দানিয়েলের মত পুরস্কৃত হবে। এইভাবে, প্রজ্ঞাপুস্তকের রচয়িতাগণ রাজশক্তিকে প্রতিহত করার আর পরাধীন ইহুদী জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়কে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছেন।

২। নতুন নিয়ম

নতুন নিয়ম পাঠ ক'রে, একজন লক্ষ্য করে যে, চারটি মঙ্গলসমাচারের সবক'টি বিশেষ বিশেষ সমাজের জন্য লিখিত আর এগুলোর রয়েছে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। তথাপি, চারটি মঙ্গলসমাচারের মধ্যে অভিন্ন দিকটি হল, মুক্তি আর সামাজিক ন্যায়বিচারে একজন প্রবক্তা হিসেবে যীশুকে তুলে ধরা।

উদাহরণ হিসেবে, মঙ্গলসমাচার রচয়িতা সাধু মথি দেখিয়েছেন যে, যীশু নব মুক্তিদাতা, নতুন মোশী।

সাধু মার্ক, যিনি তাঁর মঙ্গলসমাচারের কাঠামো আর সুবিন্যস্তকরণের জন্য সুপরিচিত, যীশুর শিক্ষা ও জীবনকে সংক্ষেপে দু'টি অত্যন্ত প্রতীকী ভাষ্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন ঃ শুরুর দিকে, যীশুর নতুন দ্রাক্ষারস পুরনো চামড়ার ভিস্তির গায়ে ফাটল ধরায়, আর শেষের দিকে মন্দিরের পর্দা ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে যায়। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে সাধু মার্ক বুঝিয়েছেন যে, তাঁর জীবন ও কাজের মধ্য দিয়ে যীশু ছিঁড়ে দুই ভাগ করে ফেলেছেন খোদ সমাজ-কাপড়কেই।

দীনদরিদ্রদের মঙ্গলসমাচার হিসেবে পরিচিত সাধু মার্কের মঙ্গলসমাচারে রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ, যেগুলি দরিদ্র-অসহায়, পাপীতাপী, নিম্নমর্যাদার মানুষজন আর নারীদের জন্য যীশুর সহানুভূতি বা ভালবাসার প্রকাশ ঘটায় ঃ দয়ালু সামারিয়, ধনী ব্যক্তি ও লাজারুস, অপব্যয়ী পুত্র, হারানো মেষ, হারানো মুদ্রা, নিষ্ঠুর কর্মচারী, নিরাশ না হওয়া বিধবা, ফরিসি ও করগ্রাহকের উপমাসমূহ, জাখেয়র গল্প, আর মারীয়ার গীতি, ঈশ্বর-প্রশস্তি।

পরিশেষে, এমনকি আধ্যাত্মিকতার মঙ্গলসমাচার হিসেবে পরিচিত, সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচার, প্রকৃতপক্ষে রচিত হয়েছিল সম্রাট ডোমিসিয়ানের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধাচরণ ও বিরোধিতার প্রত্যুত্তরে। সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচার এই রাজনৈতিক বিষয়টি তুলে ধরে যে, সম্রাট ডোমিসিয়ান নয় কিন্তু যীশুই একমাত্র প্রভু, ঈশ্বর ও মুক্তিদাতা। সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচারে বিভিন্ন চরিত্রের তাৎপর্য হল যীশুকে মশীহ, প্রভু, রাজা আর ঈশ্বর-পুত্র বলে ঘোষণা করা, যার শীর্ষ প্রকাশ বা পরম পূর্ণতা ঘটেছে যীশুর পুনরুত্থান-পরবর্তী প্রেরিতশিষ্য সাধু থমাসের এ স্বীকারোক্তিতে ঃ "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার !"

সংক্ষেপে বলা যায়, চারটি মঙ্গলসমাচারের প্রতিটি যীশুকে এমন একজন হিসেবে উপস্থাপন করে যিনি নিপীড়িতদের ধর্মময়তাকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন। চারটি মঙ্গলসমাচারের সামগ্রিক বর্ণনায় যীশুর একই রকম চিত্র পাওয়া যায়।

মুক্তিদাতা যীশু

বলতে গেলে প্রায় সকল শাস্ত্রব্যাখ্যাবিদ আর পণ্ডিতগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যীশুর বাণীপ্রচার ও শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঐশরাজ্য। এই ঐশরাজ্য হচ্ছে, বিশ্বাসীদের একটি সমাজ যেখানে ঈশ্বরের শাসন জয়যুক্ত হয়, যেখানে ন্যায্যতা, প্রেম আর সমতা প্রাধান্য পায়। ক্যাপেনের ন্যায় লেখকগণ প্রস্তাব করেছেন যে, যীশুর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল সকল প্রকার উৎপীড়ন-নিপীড়ন থেকে লোকদের মুক্ত করা। তাঁর প্রকাশ্য জীবনের শুরুতে সমাজগৃহে যীশুর বাণীপ্রচারে (লুক ৪:১৮-১৯) প্রকাশ পায় সংক্ষেপে তাঁর প্রেরণকাজের সারবত্তা ঃ "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার ওপর নিত্য অধিষ্ঠিত, কারণ প্রভু

আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীন-দরিদ্রদের কাছে মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করতে, পদদলিত মানুষকে মুক্ত করে দিতে এবং প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে।" প্রবক্তা ইসাইয়া থেকে নেওয়া এ ঐতিহাসিক কথাগুলো এটাই নির্দেশ করে যে, যীশু মুক্তিমূলক প্রাবক্তিক কাজের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

যীশু সামাজিক নির্যাতনের বিরোধী ছিলেন। সমাজের নিম্নমর্যাদার লোকদের সঙ্গে একই খাবার টেবিলে বসে তাদের সঙ্গে সহভাগিতার অভ্যাস যীশুর ছিল, যেমন করগ্রাহক, পতিতা, পাপী। সেই সময় এমনটি দেখা বা শোনা যেত না যে, একজন ধর্মাচার্য এ শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করছেন। তাঁর এই অভ্যাস বা প্রথার মধ্য দিয়ে, যীশু জাত-পাত ও শ্রেণীভেদ প্রতিবন্ধকতাগুলো ভেঙ্গে ফেলেছিলেন, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা থেকে লোকদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন। যীশুর অপর একটি 'মুক্তিপ্রদ' কাজ ছিল, মন্দিরে গিয়ে মহাজন বা পোদ্দারদের টেবিল আর পায়রাবিক্রেতাদের চৌকি উল্টে ফেলে দেওয়া। তাদের ব্যবসা থেকে যা লাভ হত, তার একটা অংশ চলে যেতে যাজকদের হাতে, কেননা তারাই ছিলেন মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক। এ ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে যীশু যাজকদের শোষণনীতির বিরোধিতা করেছিলেন, যারা মন্দিরকে তাদের লাভের জন্য ব্যবহার করে আসছিলেন।

যীশু ধর্মীয় নির্যাতনের বিরোধী ছিলেন। ধর্মের অসংখ্য আদেশ-নির্দেশসহ ইহুদী বিধান সাধারণ লোকদের জন্য একটা বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক সময় এ বিধান পালিত হত বাহ্যভাবে, আত্মায় নয়। আর হয়ে পড়েছিল অত্যধিক ধর্মানুষ্ঠানভিত্তিক। বিশ্রামবারের বিধান ইচ্ছা ক'রে ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে, যীশু লোকদের অত্যধিক ধর্মানুষ্ঠানবিধি আর আইনী বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। বিশ্রামবার মানুষের জন্য, মানুষ বিশ্রামবারের জন্য নয়। যখন তাঁর শিষ্যদের বলা হয়েছিল যে, খাওয়ার আগে তাঁর শিষ্যরা হাত ও পা ধোয়ার নীতি মানেন না, তখন তিনি 'হৃদয়ের শুচিতা'র উপর এবং বলিদান নয়, দয়ার উপর জোর দিয়েছেন।

তাঁর নিরাময়ের সেবাকাজও ছিল লোকদের মুক্ত করার একটি কাজ। সে সময় এ বিশ্বাসের প্রচলন ছিল যে, অসুস্থ ব্যক্তি শয়তানের দাসত্বে আবদ্ধ। এইভাবে, লোকদের সারিয়ে তুলে যীশু শয়তানের কবল থেকে তাদের মুক্ত ক'রে স্বাধীন ক'রে দিয়েছিলেন।

যীশু রাজনৈতিক নির্যাতনের বিরোধী ছিলেন। যীশুর আমলে, প্যালেস্টাইন সমাজ ছিল ধর্মশাসিত সমাজ যেখানে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। মহাযাজকদের আর ইহুদী মহাসভার সদস্যদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, যীশু আসলে পরোক্ষভাবে রোমের শাসনকেই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। এই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড, জনগণকে উত্তেজিত করে তোলা এবং তাদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়েছিল। তাঁর অপরাধ যদি শুধুমাত্র ঈশ্বরনিন্দার হত, কেননা তিনি নিজেকে ঈশ্বর-পুত্র বলে দাবি করেছিলেন, তাহলে তাঁকে শুধুমাত্র কয়েক ঘা বেত মেরে ছেড়ে দেওয়া হত। কিন্তু তাঁর অপরাধ ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার; এই কারণে, তাঁর শাস্তি ছিল ক্রুশমৃত্যু, এটা একটি রোমীয় শাস্তির বিধান। সুতরাং, যীশুর মৃত্যু ছিল সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রত্যেক দেশপ্রেমী ইহুদীর মত, তিনি পরোক্ষভাবে রোমীয় শাসনকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন।

যীশু অর্থনৈতিক নির্যাতনের বিরোধী ছিলেন।

যীশু অতি সাধারণ জীবন কাটাতেন। তিনি ছিলেন এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে বেড়ানো এক পথঘুরা ধর্মপ্রচারক, তাঁর নির্দিষ্ট কোন থাকবার জায়গা ছিল না। তিনি প্রায় সময় সীমিত সম্পদ থাকার পক্ষে কথা বলতেন। "ধনীর পক্ষে ঐশরাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে কোন উটের পক্ষে একটা ছুঁচের ফুটোর মধ্য দিয়ে যাওয়াই বরং সহজ!" তাঁর এমন মন্তব্য তাঁর এ শিক্ষার সুস্পষ্ট নমুনা যে, সম্পদের পাহাড় গড়াটা একজনকে তার সম্পদের দাস করে তোলে। যীশু এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার সূচনা ঘটিয়েছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল সঞ্চয় করা ও অধিকারী হওয়া অপেক্ষা সহভাগিতা আর দান করা। তিনি গরিব বিধবার প্রশংসা করেছিলেন যিনি ছোট দু'টি মুদ্রা বাক্সে ফেলেছিলেন (মার্ক ১২:৪৩-৪৪)। যীশু ধনী যুবককে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন তার সমস্ত-কিছু বিলিয়ে দিয়ে তাঁর অনুসরণ করার জন্য (মার্ক ১০:১৭)। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, "তোমরা নিজেরা যে-মাপে মেপে দিচ্ছ, তোমাদেরও ঠিক সেই মাপ মতোই দেওয়া হবে – এমন কি আরও বেশীই দেওয়া হবে" (মার্ক ৪:২৪)। ঠিক এ অর্থেই আমরা আশ্চর্যভাবে রুটি ও মাছ

বৃদ্ধির বাণীকে বুঝতে পারি, "আমরা যদি সহভাগিতা করি, ঈশ্বর বৃদ্ধি ঘটাবেন", আর তদনুযায়ী একটি প্রথাকে এগিয়ে নিতে পারি, যে প্রথা বা ব্যবস্থা আদি খ্রীষ্টীয় সমাজ গ্রহণ করেছিল – সামাজিক সহভাগিতা প্রথার অনুশীলন যাতে তাদের মধ্যে কেউ অভাবী না থাকে (শিষ্যচরিত ৪:৩২, ৩৪-৩৫)।

এটা প্রমাণ করে যে, যীশু নিজেই সামাজিক অঙ্গীকারের একটি চূড়ান্ত কাঠামোর প্রস্তাব করেছিলেন। সর্বোপরি, শিষ্যচরিত, করিন্থীয়দের নিকট পত্র আর সাধু যাকোবের ধর্মপত্রগুলোয় যেমনটি তুলে ধরা হয়েছে, আদি খ্রীষ্টীয় সমাজগুলি চেষ্টা করেছিল সহভাগিতার এই প্রথাকে এগিয়ে নেওয়ার আর এটা নিশ্চিত করার যে, খ্রীষ্টীয় সমাজে কারোর কোন অভাব নেই (দ্র: ২ করিন্থীয় ৮:১৪; যাকোব ২:১-১৯)।

৩। মণ্ডলীর পিতৃগণ

মণ্ডলীর ইতিহাসের গঠনমূলক কালে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান শিক্ষাগুরুগণ, যাদেরকে বলা হয় মণ্ডলীর পিতৃগণ, বিভিন্ন নীতিমালার আর ভাবদর্শনের প্রস্তাব করেছিলেন, যেগুলির লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্টীয় সমাজের সামাজিক অঙ্গীকারের বিকাশসাধন।

সম্পদ থাকা ও সহভাগিতা। বলতে গেলে, মণ্ডলীর প্রায় সকল পিতৃগণ এ কথা প্রচার করেছিলেন যে, সকল সম্পদের মালিক ঈশ্বর, এই কারণে খ্রীষ্টানদের দায়িত্ব হল, যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে, তা হলে তা দান করে দেওয়া। উদহারণ হিসেবে সাধু আম্ব্রোজ বলেছিলেন, "যখন তুমি কাউকে কিছু দিচ্ছ, তখন যা তোমার তা তুমি তাকে দিচ্ছ না, কিন্তু যা তার তা তুমি তাকে ফিরিয়েই দিচ্ছ।" একইভাবে, সামসঙ্গীত ১৪৭:১২ পদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাধু আগস্টিন বলেছেন, "ধনীদের প্রয়োজনাতিরিক্ত যত সম্পদ, দরিদ্রদের জন্য যত চাহিদা" তাই প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ যখন সঞ্চিত করা হয়, তখন অন্যদের সম্পত্তিই সঞ্চিত করা হয়। একজন বলতে পারেন যে, ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বিয়ার ম্যাডলিনে লাতিন আমেরিকার বিশপগণ কর্তৃক দরিদ্রদের জন্য অগ্রাধিকার গৃহীত হওয়ার অনেক আগেই মণ্ডলীর আদি পিতৃগণ এর সমর্থন জানিয়েছিলেন।

দরিদ্রদের জন্য ভাবনা। দরিদ্রদের জন্য ভাবনার অংশ হিসেবে পিতৃগণ পুনঃ পুনঃ একটি সামাজিক তহবিলের উপর জোর দিয়েছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন সাধু বাসিল, পরিব্রাজকদের জন্য অতিথি-শালা গড়ে তুলেছিলেন । সাধু যোহন খ্রীসোস্তম এমনকি সকল প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনে সম্পত্তির সাধারণ মালিকানা সমর্থন করেছিলেন। সাধু মথি ২৫:৩১ পদ সম্পর্কে তাঁর এক ধর্মোপদেশে তিনি বলেছিলেন, "তুমি কি সত্যি সত্যিই খ্রীষ্ট দেহের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে চাও ? তাহলে তাঁকে অবহেলা করো না, যখন তিনি বিবস্ত্র। একই সময়ে, যখন তুমি এখানে সিল্কের ঝালরে ঘেরা গীর্জায় তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, বাইরে যখন তিনি ঠাণ্ডায় ও বস্ত্রহীনতায় কষ্ট পাচ্ছেন তাকে উপেক্ষা করো না।"

দাসত্ব আর সুদের কারবার। মণ্ডলীর পিতৃগণ সকল মানুষের একতায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, তাই তাঁরা দাসত্বকে একটি সামাজিক প্রথা মনে করে একে ত্যাগ করেননি, তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন দাসদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর। তারা দুর্ব্যবহার বন্ধ করেছিলেন, দাসদের জন্য অনেক মাণ্ডলিক দপ্তর খুলেছিলেন, আর মণ্ডলীগুলো পালিয়ে আসা দাসদের আশ্রয় দিত। অন্যদিকে সুদ ব্যবসাকে সব সময় পাপ হিসেবে গণ্য করা হত।

যুদ্ধ ও বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগদান। মণ্ডলীর পিতৃগণ যুদ্ধ আর সেনাবাহিনীতে যোগদানের বাধ্যবাধকতারও বিপক্ষে ছিলেন। তবে, সম্রাট কনস্টানস্টাইনের পর, তাঁরা তাদের এ অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, কেননা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাইরের আক্রমণ থেকে সীমান্ত রক্ষায় সৈন্য প্রয়োজন।

মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক। মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের অধিকারক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন এমন ধারণায় মণ্ডলীর পিতৃগণ বিশ্বাস করলেও, তাঁরা মনে করতেন যে, রাষ্ট্রের সমালোচনা করার অধিকার মণ্ডলীর আছে, বিশেষ করে যখন রাষ্ট্র অরক্ষিতদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হত।

৪। পোপ মহোদয়গণের সামাজিক সার্বজনীন পত্র

সামাজিক বিষয়াদিতে মণ্ডলীর সব সময় সম্পৃক্ততা থাকলেও, পোপ মহোদয়গণ মোটামুটি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের দিক থেকে সামাজিক নানা বিষয়কে ঘিরে সার্বজনীন পত্র লিখতে শুরু করেছিলেন। এগুলোকে বলা হয় সামাজিক সার্বজনীন পত্র আর মণ্ডলীর সামাজিক অঙ্গীকারে এগুলোর

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। পোপ মহোদয়গণ কালের নানা সামাজিক বিষয়কে নৈতিক বা ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছিলেন। আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের ধর্মপালগণ তাদের নিজেদের অঞ্চলে বা দেশে একইরূপ বিষয়ের উপর আলোকপাত ক'রে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। এ সকল দলিল সামাজিক অঙ্গীকারের জন্য লোকদের অনুপ্রাণিত করার জন্য অমূল্য সম্পদ। তবে এখানে আলোচনা করা হবে সেই সব সামাজিক মূলভাবগুলি নিয়ে, যেগুলি নিয়ে পোপ মহোদয়গণের সামাজিক সার্বজনীন পত্রে আলোচিত হয়েছে।

পোপ ত্রয়োদশ লিও-এর অন্যতম মুখ্য ভাবনা ছিল শিল্প বিপ্লবের দরুণ শ্রমিক শ্রেণীর করুণ অবস্থা। তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর যুগান্তরকারী সার্বজনীন পত্র Rerum Novarum (1891), এখানে তিনি জোর দিয়েছেন নৈতিক কর্ম-স্থানের উপর : শ্রমজীবিদের অধিকার আছে ন্যায্য মজুরী পাওয়ার, নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিবেশের আর নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে সমিতি গঠনের। পরে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে, পোপ দ্বিতীয় জন পল এ সকল ধারণার ব্যাখ্যা যুগিয়ে তাঁর Laborem Exercens নামের সার্বজনীন পত্রে জোর দিয়েছেন পুঁজির উর্ধ্বে শ্রমিকের অগ্রাধিকারের উপর। এ সকল ধারণা বিশ্বজুড়ে সামাজিক নানা আন্দোলনের, হোক তা শ্রমিকদের আন্দোলন কিংবা জনগণের আন্দোলন, অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।

পোপগণের অতীব ভাবনার অপর একটি বিষয় ছিল ধনী শ্রেণীর বিলাসবহুল জীবন আর দরিদ্র শ্রেণীর করুণ অবস্থা –এ দু'য়ের মধ্যে ব্যাপক ফারাক। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, Populorum Progressio নামের সার্বজনীন পত্রে পোপ ষষ্ঠ পলই ছিলেন সর্বপ্রথম যিনি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দরিদ্রতার কাঠামোগত কারণগুলি বিশ্লেষণ করেছিলেন। এ সকল দেশে অনুন্নয়নের প্রধান প্রধান কারণের মধ্যে হল ঔপনিবেশবাদ, নয়া ঔপনিবেশবাদ (কম উন্নত দেশগুলির উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে শক্তিশালী দেশসমূহের নিয়ন্ত্রণ), অসম বাণিজ্য প্রথা, আর দুর্নীতি। পোপ দ্বিতীয় জন পল সর্বোপরি আন্তর্জাতিক ঋণ বিপর্যয়ের নিন্দা আর ঋণের ভারে জর্জরিত দেশগুলোর ঋণ মওকুফ করে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন।

পোপ মহোদয়গণের নিকট অত্যন্ত প্রিয় অপর একটি বিষয় হল মানব-মর্যাদা আর মানবাধিকার। Pacem in Terris নামের তাঁর সার্বনজনীন পত্রে পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন মানবাধিকারের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরেছেন – এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চার প্রধান স্বাধীনতা : (ক) **ধর্মীয় স্বাধীনতা**, (২) **বাক্ স্বাধীনতা,** (গ) **অভাব মুক্তি** (কাজ করার অধিকার, অর্থনীতিতে স্বাধীন উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা, দেশত্যাগ/অভিবাসনের স্বাধীনতা) আর (ঘ) **ভীতি মুক্তি** (সুষ্ঠু বিচার পাওয়ার অধিকার)। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের আর এর সহায়ক সংগঠনগুলির কাজকে পোপগণ অকুণ্ঠ সমর্থন যুগিয়ে এসেছেন।

তথাপি অপর একটি বিষয় যার প্রভাব পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পড়ছে হল যুদ্ধ ও শান্তি। Pacem in Terris নামের সার্বনজনীন পত্রে পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন গুরুত্বারোপ করেছেন যে, মণ্ডলী তার ইতিহাসের একেবারে জন্মলগ্ন থেকেই সব সময় শান্তির পক্ষে, কখনো যুদ্ধের পক্ষে নয়। পারমাণবিক যুদ্ধ আর অস্ত্র প্রতিযোগিতার নিন্দা জ্ঞাপন করা হলেও, ধর্মময়তার কারণে ঐতিহ্যবাহী যুদ্ধকে কিছু শর্তসাপেক্ষে মেনে নেওয়া হয়েছে। তবে, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার সময়কাল থেকে, বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধানের সুবাদে, বিশপগণ যুদ্ধের বিবেকসম্মত বিরোধিতার ক্ষেত্রে অনেক বেশী সক্রিয় হয়ে উঠেছেন আর ধীরে ধীরে শান্তিবাদী ও অহিংসার ঐশতত্ত্বের লক্ষ্যে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন।

আরও একটি বিষয়, যা নিয়ে ১৯৭০ দশক থেকে পোপগণ বেশ সোচ্চার, তা হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা। বিশেষত: পোপ দ্বিতীয় জন পল এই সংকট নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব প্রচেষ্টার অভাবকে খুবই সমালোচনা করেছেন। Sollicitudo Rei Socailis নামের সার্বজনীন পত্রে পোপ দ্বিতীয় জন পল পরিবেশ ধ্বংসের নৈতিক অন্যায্যতার ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তিনি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আর বর্তমান প্রজন্মের জন্য করা ক্ষতিসাধন সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

সামাজিক সার্বজনীন পত্রগুলির অনন্যতা সম্পর্কে যা বলা যায়, তা হল, এগুলি আলোকপাত করে যে, সামাজিক বিষয়সমূহ হচ্ছে, নৈতিক বিষয়সমূহ আর তাই এগুলিকে ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ বিচার করতে হবে। বিশপগণ, তাদের ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের সিনডে, ঘোষণা

করেছেন যে, "ন্যায্যতার পক্ষে কাজ আর জগতের রূপান্তরে অংশগ্রহণ হচ্ছে সুসমাচার তথা মণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বের একটি অপরিহার্য দিক" (জগতে ন্যায্যতা, ৬)। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ষষ্ঠ পল আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে, 'পরিত্রাণের' মধ্যে 'মানুষকে পীড়াদায়ী সমস্ত কিছু থেকে মুক্তি'র (খ্রীষ্টাদর্শ প্রচার, ৯) ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সবশেষে পোপ দ্বিতীয় জন পল সামাজিক অঙ্গীকার সংক্রান্ত ধারণাটির সত্যিকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যখন তিনি "দরিদ্রদের জন্য মণ্ডলীর অগ্রাধিকার" আর "সামাজিক কাঠামোগত পাপ" (Sollicitudo Rei Soccialis, 42, 36, 46) নির্মূলীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেছেন, আর তিনি তাঁর ঘোষণা বা ব্যাখ্যার সমাপ্তি টেনেছেন Centsimus Annus নামের পত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে (৩৫)।

সুতরাং, **মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষাগুলো একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন ও নৃতত্ত্বের ব্যবস্থা করে,** যা সকল সমাজসেবী, সমাজ সংগঠক আর কর্মীদের জন্য, তাদের মুক্তিমূলক কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি, ধরন, স্পষ্ট প্রকাশ আর উৎকর্ষসাধনের লক্ষ্যে, **একটি অপরিহার্য নির্দেশিকা আর সহায়ক নির্দেশক হিসেবে কাজ করতে পারে** (Compendium, 522, 524)। আগে, খ্রীষ্টীয় সমাজসেবী ও কর্মীদের মধ্যে এমন ধারণা কাজ করত যে, অধিকারহীনদের অধিকারের জন্য তাদের কাজ ও সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে মণ্ডলী ও তার শিক্ষাগুলো শুধুমাত্র অসহায়কই নয় কিন্তু একটি ইতিবাচক অন্তরায়ও। আর এই কারণে, তারা সমর্থন পাচ্ছেন না, এমনটি মনে করে তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে পাশ কাটিয়ে চলতেন কিংবা গণ্ডীবদ্ধ করতেন। আর আজকে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা (STC) এ সকল কর্মী ও তাদের যত কর্মকাণ্ডের জন্য শুধুমাত্র একটি চমৎকার সহায়িকা আর শক্তিশালী অনুপ্রেরণা স্থলই নয়, এটা আরও হচ্ছে, একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যার সাহায্যে তারা অভিন্ন সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ধর্মনিরপেক্ষ আর অ-খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা করতে পারে (Compendium, 534)।

৫। মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্বসমূহ

জগতের সর্বত্র খ্রীষ্টধর্মের সামাজিক অঙ্গীকারের উৎকর্ষসাধনে অপর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গতিশীলতা হচ্ছে, একটি প্রক্রিয়া, যাকে বলা হয়, মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্ব। আর এ ঐশতত্ত্বের জন্ম লাতিন আমেরিকায় ১৯৬০ এর দশকে। তবে আজকে অনেক ডাল-পালা গজিয়ে এটা জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। একজন যে শুধুমাত্র এশিয়া আর আফ্রিকা মহাদেশে মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্বের স্বতন্ত্র গতিধারা লক্ষ্য করে তা নয়, কিন্তু আরও লক্ষ্য করে যে, এর শিক্ষাদানপদ্ধতি আজকে অন্যান্য মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্বকেও উদ্দীপিত করছে, যেমন ঃ কালো মানুষদের ঐশতত্ত্ব, নারীবাদী ঐশতত্ত্ব, পরিবেশবাদী ঐশতত্ত্ব আর অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ঐশতত্ত্ব।

অটো মাদুরো মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্বকে এ বলে অভিহিত করেছেন, "আন্দোলন ও মতানৈক্যের একটি গতিধারা। লেমান একে বর্ণনা করেছেন এ বলে– রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কে ধর্মকে সুবিন্যস্তকরণের এক নতুন পন্থা। মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্বের অগ্রনায়কদের পছন্দমত মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্ব মূলতগতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক মণ্ডলীর রূপান্তর ঘটাতে না পারলেও, জগতজুড়ে এর প্রভাব কিন্তু ব্যাপক। অনেকের মতে, ভাটিকানের বিরোধিতার কারণেই মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্ব এর প্রতিষ্ঠাতাগণের স্বপ্ন অনুসারে সফলতা লাভ করতে পারেনি। মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্বের সমর্থক বিশপগণের স্থানে বসানো হয়েছিল রক্ষণশীল বিশপদের, যারা অনুসরণ করেছিলেন গোঁড়া কর্মসূচী। তথাপি, অসংখ্য গবেষণাকর্মে লাতিন আমেরিকায় রাজনৈতিক ও সামাজিক গতিধারার উপর মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্বের বলিষ্ঠ প্রভাব দলিলবদ্ধ আছে : এল সালভাদরে লৌকিক মণ্ডলীর বিকাশ থেকে শুরু করে মৌলিক খ্রীষ্টীয়সমাজগুলোর বৃদ্ধি, ব্রাজিলে নাগরিক সমাজে সাধারণ পরিবর্তন (যেমন রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ) থেকে শুরু করে ভূমিহীন কৃষকদের গণ আন্দোলনের ক্রমবিকাশ পর্যন্ত, নিকারাগুয়ার মত দেশগুলোতে একজন খ্রীষ্টানের রাজনৈতিক অঙ্গীকার সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক বিপ্লবে বাস্তবমুখী অংশগ্রহণ পর্যন্ত।

মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্বের বিশেষত্ব হল, এর সূচনা-স্থল, যেমন ক্ষেত্র বা বাস্তবতা। প্রচলিত ক্ষেত্র বা বাস্তবতাকে দেখা হয় দরিদ্র, নির্যাতিত আর তৃতীয় বিশ্বের (সবচেয়ে ভাল যদি বলা হয় দুই-তৃতীয়াংশ পৃথিবী) সংগ্রামে

আত্মনিয়োগ হিসেবে। এই সম্পৃক্ততা ও আত্মনিয়োগ ব্যতীত মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্ব শুরু হতে পারে না, কেননা সম্পৃক্ততাই গড়ে তোলে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ, একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। একজন দরিদ্রদের চোখ দিয়ে সবকিছু দেখতে শুরু করে। এই দৃষ্টিকোণ হচ্ছে, গরীবদের জন্য অগ্রাধিকারের প্রাথমিক ও মৌলিক পদক্ষেপ, আর এটা বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলোর যাজক ও প্রফেসরগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরম্পরাগত ঐতিহ্য থেকে বিপুলভাবে ভিন্ন, যারা মূলত: ঐশতত্ত্ব শুরু করেছিলেন ধর্মশাস্ত্র কিংবা ধর্মতত্ত্বের উপর আলোকপাত দিয়ে। এই অনন্য সূচনা-স্থলই, অর্থাৎ ক্ষেত্র বা বাস্তবতা, মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্বে আলোকপাতের প্রক্রিয়ার সূচনা করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেক মণ্ডলী দরিদ্রদের জন্য এই অগ্রাধিকারকে তাদের আধ্যাত্মিকতা ও পালকীয় পদ্ধতির একটি মৌলিক দিক হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতিতে, অনেক যাজক, সিস্টার আর ভক্তসাধারণ দরিদ্রদের সঙ্গে বস্তিতে আর গ্রামীণ এলাকায় কাজ করতে শুরু করেছে। অনেক কাথলিক স্কুল, হাসপাতাল আর প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হল সমাজের সর্বাপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণীদের মধ্য থেকে ছাত্র-ছাত্রী, রোগী আর পৃষ্ঠপোষকদের গ্রহণ করা। মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্বে উদ্দীপিত এ সকল নীতিমালা পালকীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত জ্ঞানে চূড়ান্ত পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত হয়েছিল।

মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্বের একটি প্রধান দিক হচ্ছে সামাজিক কিংবা সংগঠিত পাপকে ঘিরে এর জ্ঞান। মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্ববিদগণের মতে, সামাজিক মন্দতা, দরিদ্রদের বড় বড় সমস্যা, অনাহার, জাতবাদ, যৌনবাদ ও অবিচার, ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে বিস্তর ফারাক, বেকারত্ব, দুর্নীতি, মুনাফার আশায় দুই-তৃতীয়াংশ বিশ্বকে বহুজাতিক কোম্পানী কর্তৃক শোষণ, পরিবেশ দূষণ, ভারসাম্যহীন বাণিজ্য নীতি ইত্যাদি হচ্ছে জগতে সত্যিকার পাপ। এ সকল পাপ, যদিও এগুলো ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড থেকে সংযুক্তহীন নয়, অনেক সময় হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ও নীতিমালার ফসল। সমাজ-বিজ্ঞানের কাঠামোর ব্যবহার ঘটিয়ে, মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্ববিদগণ বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আর গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর মৌলিক ও গোপন শোষণমূলক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাদের নিকট এ সকল প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে সত্যিকার সমস্যা, যেগুলো প্রকাশ্যে উন্মোচিত করে মোকাবিলা করা প্রয়োজন। পোপ দ্বিতীয় জন পল যেমনটি বলেছেন, "এ সকল পাপের নামকরণ গুরুত্বপূর্ণ, যেন এগুলোর মুখোমুখি হয়ে জয় করা যায়" (Sollliitudo Rei Soialis, 36, and Reconciliation and Penance, 116)।

মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্বের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর সমালোচনা আর পরম্পরাগত ঐশতাত্ত্বিক ও শাস্ত্রীয় ব্যাখা নিয়ে প্রশ্ন তোলা, কেননা এগুলো আসে অভিজাতশ্রেণী কিংবা প্রথম বিশ্বের দৃষ্টিকোণ থেকে। এই উপায়ে মুক্তিমূলক ঐশতত্ত্ব নব সন্ধির আধ্যাত্মিকসম্মত ব্যাখ্যার অনেকাংশ খোলসমুক্ত করেছে। অনেক সময় যীশুর বিশেষ কতগুলো উক্তিকে পর-জগতের নির্দেশক বলে বুঝা হয়, যখন সেগুলো আসলে এই জগতকেই নির্দেশ করে। সাধু লুকের মঙ্গলসমাচারের বিখ্যাত "তোমরা দীনদরিদ্র যারা, ধন্য তোমরা ! ঐশ রাজ্য তোমাদেরই" এ অংশটি, অনেক সময় যা এ অর্থে বুঝা হয় যে, দীনদরিদ্ররা কতই না সৌভাগ্যবান, কেননা পরজগতে তারা তাদের পুরস্কার লাভ করবে, ব্যবহার করা হয়েছে সহায়-সম্বলহীনদের "প্রশমিত" রাখার একটি কৌশল হিসেবে, এইভাবে এই জগতে শোষণ সমস্যার সমাধানে তাদেরকে প্রতিহত করা হয়।

শাস্ত্র ব্যাখ্যার সমালোচনাধর্মী এই পদ্ধতি ঐশতত্ত্বে রীতির পরিবর্তন আর কতকগুলো প্রাসঙ্গিক ঐশতত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে , যেমন নারীবাদী, পরিবেশ আর দলিত ঐশতত্ত্ব।

নারীবাদী ঐশতত্ত্ব সমালোচনা করেছে পুরুষের শোষণের আর তা অনেকগুলো শিক্ষা ও গল্পের পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছে, যেগুলো যুগ পরম্পরায় হয়তবা ভুলে যাওয়া কিংবা উপেক্ষা করা হত, আর এইভাবে ব্যবস্থা করেছে একটি অনেক বেশী 'সুষম' বা সমতাধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির। নারীবাদী ঐশতত্ত্ব অনেক খ্রীষ্টান নারীকে উদ্বুদ্ধ করেছে মণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত মৌলিক সিদ্ধান্তবলী ও নীতিমালার ক্ষেত্রে আরও বেশী পরামর্শ ও ক্ষমতার দাবি করতে।

অনুরূপভাবে, **পরিবেশবাদী ঐশতত্ত্ব**, মানবীয় দৃষ্টিকোণ ছেড়ে বিশ্বজাগতিক, বিশ্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐশতত্ত্ব নিয়ে পুনর্ভাবনাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এ ঐশতত্ত্ব অনেক খ্রীষ্টানকে উদ্বুদ্ধ করেছে দূষণকে একটি সামাজিক

পাপ হিসেবে দেখতে আর পরিবেশ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হতে, যেগুলোর লক্ষ্য হল সম্পদশূন্য হওয়া থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা। পোপ দ্বিতীয় জন পল এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, আর এই বিষয়টিকে ঘিরে প্রায় সময় তাঁর বক্তব্যদানের কারণে তাঁকে বলা হত সবুজ পোপ।

সবশেষে, **দলিত ঐশতত্ত্ব** গড়ে তুলছে এমন একটি বিশেষ ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি যা তাদের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামকে বিবেচনায় রাখে। তাদের রচনাবলী, কবিতা ইত্যাদি দলিত আন্দোলনের জন্য আর যারা দরিদ্রদের জন্য কাজ ক'রে যাচ্ছেন তাদের জন্য মহা অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে।

৬। সামাজিক ন্যায্যতাকে অসহায়তাকারী দিকসমূহ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যে সামাজিক ন্যায্যতার আর কাঠামোগুলোর রূপান্তরের উপর জোর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাহলে, একজন কিভাবে এটার ব্যাখ্যা করতে পারে যে, অধিকাংশ খ্রীষ্টান এখনো ন্যায্যতার জন্য সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, এমনকি যদিও তারা দয়ামূলক কাজের সাথে জড়িত ? অন্য কথায়, **এটা কি করে সম্ভব যে, একটি দল হিসেবে খ্রীষ্টানদের এখনো পর্যন্ত ভ্রাতৃপ্রেম থেকে ন্যাযতায় উত্তরণ ঘটেনি ?**

একটি কারণ হল, খ্রীষ্টানসহ অধিকাংশ লোক দরিদ্রতা ও অন্যায্যতার "কাঠামোগত" কারণগুলো সম্পর্কে অবহিত নয়। তবে বিষয়টা হলো, সমগ্র বাস্তবতাকে কাঠামোগত রূপ দেওয়া হয়েছে। কাঠামোগুলো শুরু হয় আমাদের নিজস্ব সামাজিক সৃষ্টি হিসেবে আর পরে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে আর সমগ্র পৃথিবীতে কর্তা হয়ে ওঠে। আমাদের মূল্যবোধের প্রকাশ হিসেবে সৃষ্ট হয়ে, কাঠামোগুলো পরে শুধুমাত্র আমাদের মূল্যবোধকেই নয়, কিন্তু সেই সাথে আমাদের সমগ্র জীবনকেও গঠন দান করে। স্কুল-খেলাধূলা, নিম্ন মজুরী, দিকনির্দেশনা প্রণয়ন, নগর পরিকল্পনা নীতিমালা, কর্মসুযোগ সৃষ্টিকারীগণ, আর সাম্প্রদায়িকবাদী, যৌনবৈষম্যবাদী নীতিমালা –এগুলো সবই হচ্ছে কাঠামো, যা মানব জীবনে বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্কুল-খেলাধূলা শুরু হয় "সুষ্ঠু দেহে সুষ্ঠু মনের" শিক্ষামূলক লক্ষ্য নিয়ে, কিন্তু এ সকল খেলাধূলা ব্যবহৃত হতে পারে স্কুল-ক্রীড়াবিদদের সম্মানিত করার আর অ-ক্রীড়াবিদ ছেলেমেয়েদের হেয় করার জন্য, ফলশ্রুতিতে স্কুল-খেলাধূলা অন্যায্য প্রতিযোগিতার মাধ্যম হয়ে ওঠে আর পরিশেষে শিক্ষার প্রাথমিক মূল্যবোধগুলোকে দুর্বল করে দেয়। একইভাবে কিছু মানুষ কর্তৃক উপস্থাপিত অর্থনৈতিক নীতিমালা ও বাজেট কিছু শ্রেণীর লোকদের বেকারত্ব, দরিদ্র আর দুর্গতির দিকে ঠেলে দিতে পারে।

খ্রীষ্টানরা যদি দরিদ্রতার কাঠামোগত কারণগুলি সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে তারা বুঝবে যে, দরিদ্রতা বিমোচনে কল্যাণ, ত্রাণ আর অন্যান্য সমাজসেবাধর্মী পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। **অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল সমাজের ঐ সকল কাঠামোর পুনর্বিন্যাস প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকা।**

একটি দল হিসেবে খ্রীষ্টানরা কেন ভ্রাতৃপ্রেম থেকে ন্যায্যতায় স্থানান্তরিত হয়নি তার দ্বিতীয় কারণ হিসেবে বলা যায় যে, তাদের মধ্যে সামাজিক ন্যায্যতার আধ্যাত্মিকতা অভাব । খ্রীষ্টধর্ম সুগঠিত অন্তর-জীবনের আধ্যাত্মিকতার অধিকারী। মনোবিজ্ঞানীগণ মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বসমূহকে আধ্যাত্মিকতা, অন্তর-জীবন আর অন্তরমুখিতার ধারণাসমূহের সঙ্গে একাত্ম বা সমন্বিত করার মত দক্ষ কাজ সাধন করেছেন। এই একই কাজ কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা করেননি। তারা তাদের তত্ত্বকে খ্রীষ্টীয় আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বিত করেননি, কিংবা তারা চেষ্টা করেননি আধ্যাত্মিকতাকে সমাজবিদ্যাগত পরিভাষায় ও প্রণালীতে ব্যাখ্যা করার। আসলে, মণ্ডলীতে কিছু যাজক আর সদস্য-সদস্যা আছেন, যারা ভয় পান সমাজবিজ্ঞানকে আর সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্বকে। একটিবার সামাজিক কাজ কিংবা সামাজিক ন্যায্যতার একটি খাঁটি আধ্যাত্মিকতা গড়ে উঠলে, একটিবার খ্রীষ্টানরা তাদের আধ্যাত্মিকতায় "কাঠামোগুলোর" নিহিতার্থ উপলব্ধি করলে, নিঃসন্দেহে বলা যায় তারা আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত আত্মকেন্দ্রিক জ্ঞানকে পরিহার করে চলবে। **পক্ষান্তরে, তারা গড়ে তুলবে অনেক বেশী সমাজকেন্দ্রিক আর কাঠামোগত মানব বাস্তবতা সংক্রান্ত জ্ঞান।**